রঞ্জনরশ্মি

শ্রীমতী বাণী রায়



মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

—আড়াই টাকা—

"জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন দেবতার
রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দিরতলে ?"

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে সুমথনাথ ঘোষ কর্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীকালী প্রেস ৬৭ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীপরমানন্দ
সিংহ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

ভ্যামপায়ার

অমিতা, আজও তোমার মুখেচোখে সহস্রবন্দিতার মদির লাবণ্যের আলোছায়া-লীলা দেখি! আকর্ণ হরিণ-নয়নে, এখনও অমিতা, আধজাগা স্বপ্নের মাধুর্য্য? তোমার শত-উপভুক্ত রক্তিম অধর অসহায় শিশুর অভিমানে এখনও স্ফুরিত হয়? যে-মনের ছায়া আজ ত্রিংশোর্ত্তীণা তোমার মুখে দেখা দিতেছে, সে-মন অত মধুর নয়। এ কথা আমি জানি।

মারি স্টোপসের পিতা বলিয়াছিলেন, "ষোল বছরে কেহ তোমার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিলে গর্ব্ববোধ করিও না। ষাট বছরে যদি সুন্দর থাক, তবে তুমি সুন্দরী। বেশী বয়সে যদি তোমার সৌন্দর্য্য থাকে, তবে তাহা আত্মার সৌন্দর্য্য।"

তোমার আত্মা? হায় অমিতা, এখনও কি তোমার আত্মা আছে? তোমার নিজের লেখা কবিতা আজ তোমাকে শুনাইতেছি—

চলো যাই তৃণক্ষেত্রে সমাধির 'পরে,
কিনে নাও দু'আনার মৌশুমীফুল,
বিছায়ে প্রণাম কর উদ্দেশে আত্মার,
আমারি নিহত আত্মা—আমি হত্যাকারী।
শাস্তি দাও, হে দেবতা, দণ্ড দাও আজি,
থেকো না নির্ব্বাক হয়ে হে জড় পুত্তলী,
বিশ্বের সভার মাঝে দেখাও আমারে,
আমি-ই করেছি হত্যা—আমি হত্যাকারী।

একটু অদ্ভুত, কিন্তু আশ্চর্য্য! তোমারি মত।

রঞ্জনরশ্মি

জমিদার রমাপ্রসন্ন রায়ের একমাত্র গর্ব্বিতা কন্যা তুমি। তোমার বড় ভাই সাগরপারের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়া ব্যস্ত। তোমার দ্বিতীয় ভ্রাতা পাটনা আদালতের ব্যারিষ্টার। তিনি তো কলিকাতাতেই আইন-জীবিকার অনুসরণ করিতে পারিতেন? কিন্তু পত্নীপুত্র সমভিব্যাহারে তিনি স্বেচ্ছায় প্রবাসী। তোমার আচার-পরায়ণা মাতা তাঁহারি নিকটে বাস করেন। কেন অমিতা?

তোমার পিতা সন্ধ্যার পর নিশাচর আখ্যা লাভ করেন সুতরাং তোমাদের বালিগঞ্জের রম্য প্রাসাদে সান্ধ্য সমাজের একমাত্র কেন্দ্রস্থল —তুমি। তোমাকে বেষ্টন করিয়া বহু মধুপের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়; বহু মধুকর তোমার শিখায় জীবনদান করে; বহুর পক্ষচ্ছেদ হয়। তাহারা তোমার পাদপীঠতলে কেবল জনতার সংখ্যা বাড়াইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে আমি একজন।

তোমার কি আছে? তুমি চলনসই গান গাহিতে পার, তুমি উৎকৃষ্ট কবিতা লেখ কখনও কখনও, এইমাত্র। তুমি কি রূপসী? না, না অমিতা; আমার মত মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিও তোমাকে সুন্দরী বলিবে না। তবে? একদিনের সান্ধ্য আসরে তোমার প্রবেশ বর্ণনা করি:—

আমরা ভৃত্যবাহিত চা-পাত্র হস্তে অধীর প্রতীক্ষা করিতেছি। সম্মুখের দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে তুমি। দরজার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তির সহিত কথা বলিতে লাগিলে। সেই অবকাশে তোমার দিকে নির্নিমেষে আমরা চাহিয়া দেখিলাম। নীলশাড়ীজড়ানো মূর্ত্তি তোমার। তন্বী সাজিবার দুরূহ প্রয়াসকে তুমি স্বীকার কর নাই। সুতরাং মধ্যবয়স্কা-সুলভ ঈষৎ স্থূল দেহ তোমার, পরিচ্ছদ এলোমেলো।

দর্ষাঙ্গী নও তুমি, গাত্রবর্ণ শ্যাম। অতি সাধারণ! আমাদের মন নৈরাশ্যমিশ্রিত ক্ষোভে বলিয়া উঠিল, "অতি সাধারণ!" আমাদের উন্মাদনার কি এই উপযুক্ত আধার? অবশেষে টাইটানিয়ার প্রমাদ কি আমাদেরও বিভ্রান্ত করিল?

তুমি কথা শেষ করিয়া আমাদের দিকে এতক্ষণে ফিরিলে। বিজলীর আলোক নিমেষে তোমার সকল মুখকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। তুমি আমাদেব দিকে চাহিয়া হাসিলে—"ভাল আছেন সব?" আমরা নিস্তব্ধ হইয়া গেলাম। আমাদের নৈরাশ্য নিমেষে অন্তর্হিত হইল। কোনও নারীর মুখে এত পবিত্রতা, এত সরসতা, এত মাধুর্য্য আমরা দেখি নাই। তুমি রূপসী কি রূপহীনা তাহা ভাবিবাব প্রয়োজন হইল না। অমিতা, তুমি অপরূপ।

কিন্তু, এই পবিত্রতা তোমার মুখেব উপর কোথা হইতে আসিল বল? আবার তোমার কবিতা শুনাই—

—তিলে তিলে হত্যা করি আপনার অশান্ত আত্মায়
কর্দ্দমকুপের মাঝে মৃতদেহ করেছি নিক্ষেপ।
আলোক সে চেয়েছিল, দিয়াছি তমিস্রা উপহার,
ভালবাসা চেয়েছিল, লালসা তাহারে মম দান।

এই কবিতা পাঠ করিয়া শুধু একটি কথাই বলিতে পারি, তুমি অত্যুক্তি কর নাই।

তোমার বিবাহ হয় নাই বলিলে লোকে মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ করিবে, তাহারা বলিবে তুমি বিবাহ কর নাই। হিন্দু কুমারীর পক্ষে তোমার বয়স কুলীনকুমারীর বয়সকেও লজ্জা দেয়। অর্থের অভাব নাই। স্তাবক প্রচুর। কিন্তু তুমি বিবাহ কর নাই। তাই বোধহয় তোমার আচারপরায়ণা মাতা পুত্রের সহিত দেশান্তরী

হইয়াছেন। তোমার আচার তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই হয়তো। কিংবা, অন্য কোনও রহস্য আছে?

অমিতা, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহি নাই। সহস্র জীবিত প্রেমিক তোমার—তোমাকে লাভ করিয়া অহরহ তাহাদের সহিত সংগ্রাম আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি গীতি-কবিতার অধ্যাপক, আমার প্রেম ক্লাসিক নহে। আমি শান্তি ভালবাসি, আমার প্রেম ভীরু সাধারণ কিশোরীর রূপ ধরিয়া আসে, সহস্র-বন্দিতা, তোমার রূপে নহে।. তাহাকে আমি তিরস্কার করি। তাহার সহিত আমার ঘরোয়া আলোচনা চলে। আমার বাহু-বন্ধনে সে স্বর্গ খুঁজিয়া পায়। আমি চাই অতি সাধারণ একটি সহজ বাঙালীর মেয়ে, যাহাকে অতি সাধারণ আবেষ্টনীতে সহজ ভাবে গ্রহণ করিব। তবু দীপশিখা, আমিও তোমার একজন দগ্ধপক্ষ পতঙ্গ। অমিতা, আমার বুদ্ধি তোমার নিকট হইতে আমাকে দূরে রাখিলেও আমার মন একান্ত ভাবে তোমারি অধীন। তাহার সে অধীনতা দূর করিবার মন্ত্র আমি জানি না। জীবিতদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভের আশাও আমার নাই।

বারীন্দ্র সংগ্রাম ভালবাসিত। সৈন্যদলে বড় অফিসার সে। যুদ্ধ তাহার ব্যবসায় মাত্র নহে, ব্যাসন! সুদীর্ঘ ছয়ফুট দেহ, চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বক্ষ লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্থানচ্যুত্য করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল। বাধা তাহাকে উত্তেজিত করিত, প্রতিযোগিতা তাহাকে উন্মাদনা দিত। এই দুইটি বস্তুই তোমার নিকটে আসিলে সে পাইত। ধনীর বেপরোয়া পুত্র সে—সভয়ে তাহার ক্যাডিলাক গাড়ীর পথ আমরা ছাড়িয়া দিলাম।

তুমি অর্দ্ধেক ধরা দিয়াছিলে, অথবা ধরা দিবার ভাণ করিতে।

বারীন্দ্রের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তোমাকে যেন সবলে নিজের কক্ষের মধ্যে টানিয়া লইতে চাহিত। তবু কেন সবলে প্রাণপণ প্রতিরোধ করিতে? তোমার মধ্যে এই অলঙ্ঘ্য বাধার অর্থ কি? যেন তোমার গজদন্তের দুর্গ হইতে কিছুটা বিচ্যুতা হইতে, ক্ষণিকের জন্য ওই প্রদীপ্ত দৃষ্টি কোমল হইয়া যাইত। আবার চেতনা লাভ করিতে, আবার নির্ম্মমগতিতে প্রেমের পথ হইতে নিজেকে ফিরাইয়া আনিতে। তোমার মধ্যে এ কি বাধা! তোমার স্তাবকদের সহিত সংগ্রামে বিজয় লাভ করিয়া বারীন্দ্র তোমাকেও জয় করিল। কিন্তু, অবশেষে তোমার মধ্যে সেই একটা কি যেন আছে, তাহার নিকটে বারীন্দ্র পরাজিত হইল। তাহাকে অন্যান্য বহুজনের মত বিক্ষিপ্ত হইতে দেখিলাম।

কর্ম্মশৈথিল্যের জন্য সমরবিভাগ হইতে বারীন্দ্র বরখাস্ত হইল। ভগ্ন দেউলের দেবহীন নিরানন্দ ছায়ার অভিব্যক্তি দেখিলাম তাহার চোখেমুখে। তোমার অনুরাগের চিহ্ন যে অধরকে আরক্ত রাখিয়াছিল, সে অধর কালিমাময় হইল নৈরাশ্য-গ্লানিতে। কেমন একটা পরাস্ত কাপুরুষ ভাব তাহার গতিভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিল! সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য হইলাম তাহার চক্ষে নিবিড় আতঙ্কের ছায়া দেখিয়া।

আরও একটি প্রাণীর রক্তে তোমার 'ভ্যামপায়ার' আত্মা সিক্ত হইয়া গেল, কিন্তু ওই আশ্চর্য্য-মুখের একটি রেখাও কঠিন হইল না! লঘুচিত্তা বিলাসিনী যদি তুমি হইতে, আমরা বাঁচিয়া যাইতাম। তোমাকে ধরিয়া ছুঁইয়া, কাঁচের বাসনের মত চূর্ণ চূর্ণ করিয়া আমরা স্বস্তিলাভ করিতাম। কিন্তু, তুমি যে ভীতিজনক, নিজের আত্মাকে শুধু হত্যা করিতেছ না, বহুকে হত্যা করিয়া রক্তশোষণ করিতেছ তুমি। অন্যকে হত্যা করিবার পাপ আত্মহত্যারূপে নিজের

উপর আরোপ করিয়া কবিতা লিখিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিলাস—মন্দ উপায় নহে। মার্টার সাজিয়া নারীর চিরাচরিত মাসোকিষ্ট-বৃত্তি তৃপ্ত করিতেছ, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নিজের নিকট মহৎ প্রতিপন্ন করিয়া নিশ্চিন্ত আছ। তবু তোমাকেই আমরা ভালবাসিয়াছি!

বারীন্দ্রের চোখে আতঙ্ক কেন? সে আতঙ্ক ভাষাহীন হইলেও তীব্র, কৌতূহল উদ্রেক করে, অথচ অস্বস্তি জানায়। সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার তো তাহার স্বভাবে ছিল না।

পার্থসারথী আমার বন্ধু। অনন্যসাধারণ মেধা তাহার। ডক্‌ট্রেটের থিসিস্‌ লিখিবার সময়ে সহসা তোমার সহিত আলাপ হইয়া গেল। আমার আবাল্যবন্ধু সে হইলেও তোমার সহিত আমি পার্থের আলাপ করাইয়া দেই নাই। কারণ, আমার ভগিনী বিনতা পার্থকে হৃদয় দান করিয়াছে বলিয়া জানিতাম।

সেই দড়ি-টানাটানির খেলা আবার দেখিলাম। পার্থের প্রদীপ্ত নয়নে রাত্রির তমিস্রা নামিয়া আসিতেছে দেখিলাম। বিনতার দেহ বিশীর্ণ হইতেছে দেখিলাম। যে ধ্বংসদেবতা একহস্তে তাহাদের উভয়ের ধ্বংস আনিতেছেন, সেই দেবতা আবার অন্য হস্তে তোমার সর্ব্বাঙ্গে লাবণ্য বর্ষণ করিতেছেন তাহাও দেখিলাম।

বাধ্য হইয়া তোমার নিকটে গেলাম,—"অমিতা, তুমি পার্থকে ভালবাস?"

একটা নীচু কাউচে বসিয়া গ্রামফোনের রেকর্ড বাছিতেছিলে, চকিতে মুখ ফিরাইলে,—"ভালবাসি? না।"

যেন ভালবাসা তোমার পক্ষে একটি মহা অপরাধ।

"তাহলে ওকে মুক্তি দাও না।"

তুমি উঠিয়া দাঁড়াইলে, অশান্ত গতিতে সারা ঘর দুই একবার ভ্রমণ করিয়া আমার নিকটে দাঁড়াইলে—"আমাকে ও মুক্তি দিক।"

"অমিতা, তুমি চিরদিনই মুক্ত। তুমি তা জান।"

"তোমাকে বিশেষ বন্ধুর মত দেখি তাই বলছি, আমি মুক্ত নই। কোনখানে বেশী বাঁধা বলে অন্যত্র বন্ধন চাই না।"

"তবে পার্থ কি করবে, অমিতা?"

"জানি না, আমাকে বিরক্ত না করলেই হল। এদের এই আকর্ষণ প্রতিরোধ করতে আমার কি কষ্ট হয় না?"

"প্রতিরোধের দরকার কি, অমিতা?

আমার সন্নিকটে দাঁড়াইয়া তিক্ত হাসির সহিত উত্তর দিলে, "তুমি বুঝবে না!"

নিঃশব্দে চলিয়া আসিলাম। বিনতার ম্লান মূর্ত্তি অহরহ মনে জাগরূক থাকিলেও বেশী বুঝিবার প্রচেষ্টার দাবী আমার নাই। কিন্তু মনে হইতে লাগিল ওই অসামান্য মনও কোথায় বাঁধা আছে! সে কোন অসামান্য বস্তু?

কিন্তু বেশী বুঝিবার প্রচেষ্টাই অবশেষে আমারও ধ্বংস আনিল। তোমার রহস্যের যবনিকা উন্মোচিত হইল। নিজের বুদ্ধির প্রাবল্যে তোমার ভীষণতা অনুভব করিয়া আমিও পালাইয়া আসিলাম। সম্পূর্ণ অন্য কারণে আমার চক্ষেও আতঙ্কের ছায়া ফুটিয়া উঠিল।

পার্থ এখন ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিয়া আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে। তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে কুক্ষণে তোমার নিকটে অনুরোধ লইয়া গিয়াছিলাম। কুণ্ঠিত-দীন কণ্ঠে বিনতা বলিয়াছিল, "দাদা, তোমার বন্ধু অমিতাদি তাঁকে একবার ডাকলেই তিনি ফিরে আসবেন।"

আমার অনুরোধ শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াছিলে আজ স্পষ্ট মনে আছে, "পার্থকে ডাকা সম্ভব নয়। তাকে বিয়ে করতে পারব না তো।"

"বিয়ে তো একদিন কাউকে করতেই হবে, অমিতা।"

তুমি তোমার একাদশতম চায়ের পাত্র মুখে ধরিয়াছিলে—গভীর অর্থপূর্ণ আশ্চর্য্য তোমার চক্ষু দুইটি, রহস্যের সহিত ব্যঙ্গের দুর্লভ সমাবেশ। একখানি ক্রীম-ক্র্যাকার আমার দিকে অগ্রসর করিয়া টি-পট হইতে আর এক পাত্র চা আমার জন্য ঢালিতে ঢালিতে অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিলে, "বিয়ে আমার পক্ষে অসম্ভব।"

জীবনে প্রথম তোমার উপর আমার তীব্র ক্রোধ এবং ঘৃণার উদ্রেক হইল—"অসম্ভব! কেন অসম্ভব? বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।"

বিদ্যুৎচমকের উজ্জ্বল তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলে, "সাবধান। তোমার বুদ্ধি বেশী বলেই জানি। কিন্তু বুদ্ধির বাইরেও একটা জগৎ আছে।—"There are some more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"—

"অমিতা, তুমি কি জান না তোমার চেয়ে দশবছরের ছোট আমার বোন বিনতা এই পার্থকে ভালবাসে। তারই অনুরোধ তুমি পার্থকে একবার ডাক।"

অন্যমনস্ক ভাবে বলিলে, "বিনতা পার্থকে ভালবাসে! জানতাম না। বিনতাকে বলে দিও পার্থকে এমন কথা জানিয়েছি যার পরে, সে আমার আশা রাখতে পারে না।"

"কিন্তু অমিতা, যতদিন তুমি অন্য কাউকে বিয়ে না করছ ততদিন তোমার অনুরক্তেরা অন্য কারো দিকে ফিরে চাইতেও পারবে না,

তা সে অন্য কেউ তাদের জন্য প্রাণই দিক না কেন।"—আমার গলা ধরিয়া আসিল।

"তুমি জানোনা, আমি বিয়ে করতে পারি না।"—নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ততায় আর এক পাত্র চা ঢালিয়া মুখে ধরিলে।

অসহ্য! অমিতা, আমার নিকটেও তুমি সেদিন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিলে, "বিয়ে আমরা সকলে তোমাকে জোর করে করতে বাধ্য করাব। সমাজের মঙ্গলের জন্য তোমার বিয়ে করতে হবে। তোমার কৌমার্য্য-বিলাস সাধারণের কাছে বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে! স্বপ্ন নিয়ে ভুলে থাকবার বয়স তোমার নেই, দায়িত্ব এড়িয়ে কতদিন চলবে, বল? নিজের প্রকৃত রূপ তুমি দেখতে পাও না। আমরা দেখি। তোমার কবিতা পড়ে বিনতা তোমার অন্ধ ভক্ত ছিল, সে আজ তোমাকে ঘৃণা করে। ডগ্ ইন্ ম্যান্জার! তোমার আটালাণ্টার রেস আজও শেষ হ'লনা? পার্থ কি করে তোমার আশা ছাড়তে পারে?"

সহসা আমার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিলে—"কি করে ছাড়তে পারে এস দেখাচ্ছি। মূর্খ তুমি, না জেনে আমার বিচার করতে যেও না।"

তোমার দৃঢ় আকর্ষণে অনাত্মীয় পুরুষ আমি বসিবার ঘর হইতে দ্বিতলে তোমার শয়নকক্ষে উপনীত হইলাম। জনশূন্য বাড়ীতে নির্জ্জন সন্ধ্যা, দর্শক কেহ ছিল না।

"দেখ, দেখ, কেন আমি বিয়ে করতে পারি না। যারা আমার প্রার্থী কেবল তাদেরি এ কথা বলেছি! কিন্তু, তোমার নিষ্ঠুর সমালোচনা আমার অসহ্য।"—সবলে শয়নকক্ষের ভিতরের ঘরটির রুদ্ধ তালাবদ্ধ দুয়ার খুলিয়া দিলে। বৈদ্যুতিক আলোর উজ্জ্বলতায়, গৃহটির অন্ধকার মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদূরিত হইল।

প্রাচীর গাত্রের কয়েকখানি চিত্রের দিকে চাহিয়া তোমার রহস্যের

যবনিকা আমার নিকটে চিরদিনের মত উন্মোচিত হইয়া গেল। তোমার মুখে বিজয় হাস্য, তোমার বিদেহী প্রণয়ীর নিকটে আমারও চরম পরাজয় দেখিবার আশায় তোমার চক্ষে আত্মপ্রসন্ন অপূর্ব্ব দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। জীবিতদের সহিত সংগ্রাম চলে, মৃতের নিকটে শূরশ্রেষ্ঠও নিরস্ত।

মধ্যপ্রাচীরে সুদর্শন তরুণ যুবকের বিরাট তৈলচিত্র লম্বিত। সহসা মনে হয় রক্ত-মাংসের মানুষ দাঁড়াইয়া আছে, মনে ভীতিবিস্ময়ের উদ্রেক হয়। দুইপার্শ্বে নববিবাহিত দম্পতীর রঞ্জিত বৃহৎ দুইখানি চিত্র। ওই যুবকের পার্শ্বে বসিয়া আছ কিশোরী তুমি, নিম্নে প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বের তারিখ। দ্বিতীয় প্রাচীরে সেই তরুণের শ্মশানযাত্রায় শবদেহের চিত্র। নিম্নের তারিখ সপ্তদশ বৎসর পূর্ব্বের। তৃতীয় প্রাচীরে তোমার মৃত পতির অসংখ্য চিত্র, নানা বয়সের, নানা বেশের। সারা গৃহে পুরুষের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সজ্জিত। মিশরের পিরামিড!

দেখিলাম একদৃষ্টে তুমি তোমার অশরীরী প্রণয়ীর প্রতি চাহিয়া আছ—যেন কোনও গোপন উৎস হইতে কাহারও প্রেমের সঞ্চিত ধারা তোমার মুখে অপরূপ সরসতা জোগাইতেছে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া পলাইয়া আসিলাম।

জীর্ণ সমাজের শেষ প্রতীক তুমি। বিদ্রোহ মনে স্পর্শ করিয়াছে তবু অভিজাতবংশের শীলতা প্রহরীর মত তোমাকে ঘেরিয়া আছে। হয়তো অকালবৈধব্যে মর্ম্মাহত মাতা-পিতা বড় সাধ করিয়া তোমাকে কুমারীর বেশে সাজাইয়া মনের অনুশোচনা মিটাইতে চাহিয়াছিলেন। নবপরিচিতদের নিকট হইতে তোমার বিগত জীবন গোপন করিয়া তাঁহারা তোমাকে হিন্দু বিধবার অবশ্য পালনীয় কঠোরতা অবলম্বন

করিতে দেন নাই। সমাজের বিরুদ্ধে তাঁহাদের বিদ্রোহ—ওইটুকু মাত্র।

তোমার বিদ্রোহ আরও বেশী। তোমার বিদ্রোহের মাত্রা সহ্য করিতে না পারিয়া তোমার মাতা এবং ভ্রাতা পলাতক। কিন্তু হায় অমিতা, তোমার বিদ্রোহ যে আপোষ নিষ্পত্তির নামান্তর মাত্র।

অজ্ঞান বালিকাবয়সে জমিদারদুহিতার মর্য্যাদানুযায়ী বাল্যবিবাহ তোমার অমতে সম্পূর্ণ অপরিচিত জনের সহিত হইয়াছিল। নারীত্ব বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই সীমন্ত আকস্মিকভাবে সিন্দুরশূন্য হইল। তোমার প্রেম যখন জাগিয়া উঠিল, তখন তাহার ভার কে বহিবে? তোমার আশ্চর্য্য ইন্‌টেলেকচুয়াল মন বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চাহিল সমাজের অর্থহীন অনুশাসনের বিরুদ্ধে। নারীর চিরাচরিত সংস্কার তখনি তর্জ্জনী উদ্যত করিল। সুতরাং তুমি সত্যই অদ্ভুত হইলে—তুমি প্রেম করিলে বিবাহ বাদ দিয়া।

অমিতা, মনে ভাবিতেছ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছ, সংগ্রাম করিতেছ লালসার বিরুদ্ধে? তোমার সাহস নাই, অথচ ভণ্ডামি আছে। নিজের আত্মসংযমে নিজের উপর শ্রদ্ধা বাড়িতেছে, নিজেকে মহৎ কল্পনা করিয়া বাঁচিয়া আছ তুমি। পরলোকগত, বহুদিন-বিস্মৃত স্বামীর বাষ্পের ন্যায় আকারহীন স্মৃতি তোমার জীবনে ধর্ম্মোন্মাদ আনিয়াছে। পুতুলপূজা তুমি কর না, তুমি আধুনিকী। অথচ এই তপশ্চর্য্যার পৌত্তলিকতা জগতের বাহিরে তোমাকে লইয়া গিয়াছে। তুমি স্বতন্ত্রতায় অনন্যসাধারণ হইয়াছ। পবিত্রতা তোমার মুখে বাসা বাঁধিয়াছে, প্রেমিকজনের রক্তশোষনকারী আত্মার আত্মজিজ্ঞাসা নীরব করিয়াছ অদ্ভুত উপায়ে। শত প্রেমিকের হত্যার রক্তে অপরূপ দ্যুতি লাভ করিয়াছে তোমার ওই মুখখানি।

চরম বিদ্রোহের সাহস তোমার নাই, কাপুরুষমনা। ভাল করিয়া পরিচয়ের পূর্ব্বে যে প্রেমিক তোমাকে নিস্ফলা মরুভূমির বন্ধ্যাত্বে বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া গেল, তাহারি উদ্দেশ্যে তাহার ক্ষীয়মান সামান্য একটু স্মৃতিরেখাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া জীবনের দিক হইতে যে সমাজ তোমাকে মুখ ফিরাইয়া কর্কশ শুষ্ক জীবন-যাপন করিতে আদেশ দেয়, তাহাকে তোমার বুদ্ধিপ্রখর কবিচিত্ত মানিতে চাহে না। তোমার সতেজ, আধুনিক মন প্রাচীন-গলিত সমাজের এই নির্ব্বোধ অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু, দীর্ঘ দিনের বন্ধনে অভ্যস্ত অভিজাত-রক্তধারার সম্পূর্ণ বিদ্রোহের সাহস নাই। তাই এই বীভৎস রূপ তুমি ধরিয়াছ, অমিতা। প্রেমকে নামমাত্র মূল্যে গ্রহণ করিয়া অবহেলায় পথের পার্শ্বে ফেলিয়া গিয়াছ, প্রেমের নিকটে ধরা দাও নাই। নিজের সংস্কার বজায় রাখিতে গিয়া তারুণ্যের আত্মদানে তুমি প্রশ্রয় দিয়াছ। শত সহস্র জীবন দিয়া গ্রথিত তৈমুরের বিজয়স্তম্ভের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া মৃতের উপাসনায় নিজের আত্মরতির উপাসনা করিয়া তুমি ভাবিতেছ—তুমি সাধারণের বহু উর্দ্ধে। অমিতা, সত্যই তুমি অপরূপ!

ঈর্ষ্যা

শোন বান্ধবী প্রীতিরেণু দত্ত, আমি তোমাকে ঈর্ষ্যা করি। একজন রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে যতটা ঈর্ষ্যা সম্ভব, আমি তোমাকে তাহাই করি। তুমি আমার কাছে আর আসিও না।

জানি তুমি আবার আসিবে, নিঃশব্দে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া খাটের শুভ্র আচ্ছাদনীর উপর বসিবে, নির্ব্বোধের মত অনেক কিছু বাজে কথা কহিবে। নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার জন্য, যে সকল পুস্তক পড়িয়া গিয়াছ অথচ বোঝ নাই, তাহাদের বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে। তোমাকে সাগ্রহে আমার চা ও কেক জোগাইতে হইবে। কিন্তু, তোমার মুখের প্রতিটি কথায় আমার নরক-যন্ত্রণা আসিবে, তোমার মুখের প্রতিটি রেখার দিকে চাহিয়া আমার সমস্ত দিবসের আনন্দ তৃণখণ্ডের মত জ্বলিয়া যাইবে। সুতরাং, প্রীতিরেণু দত্ত এম্-এ, তুমি এখানে আর আসিও না।

অনেক কিছুই তোমার সহ্য করিয়াছি, চিরকাল করিতেছি। এক শিক্ষালয়ে যে পাঠ একসঙ্গে আরম্ভ করিয়াছিলাম, এক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার সমাপন হইয়াছে। তোমার অহেতুক উপদেশ সহ্য করিয়াছি। তোমার সস্নেহ অবজ্ঞা, সবজান্তা প্রথায় মুরব্বীয়ানা সহ্য করিয়াছি। বেপরোয়া ভাবে সাহিত্য আলোচনার নামে তোমার অজ্ঞানতা প্রদর্শন সহ্য করিয়াছি। কিন্তু, আজ আমার তোমাকে অসহ্য হইয়াছে, এ কোন কারণে নয়, অসহ্য হইয়াছে তোমাকে ঈর্ষ্যা করি বলিয়া।

তুমি প্রথমাবধি পরীক্ষায় আমার অপেক্ষা বেশী নম্বর পাইয়া আসিয়াছ, তাহার জন্য আমি তোমাকে ঈর্ষ্যা করি না। লোকে

তোমার কোমল স্বভাবের প্রশংসা করে, তাহার জন্যও নহে। রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ তুমি উজ্জ্বল তারকাবিশেষ। প্রাভাতিক সংবাপত্রে আবহাওয়ার রিপোর্টের মত অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রত্যহ তোমার নাম দেখি। তাহার জন্যও আমার কোন বিকার নাই।এ সমস্ত কার্য্যাবলী তো পূর্ব্বেও তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত, সব পরীক্ষায় তুমি আমার অপেক্ষা বেশী নম্বর পাইতে, তোমার নিৰ্জ্জীব ন্যাকামিকেও অনেকে স্বভাবমাধুর্য্য বলিয়াছে—তাহার জন্য তোমাকে আমার অসহ্য লাগে নাই। অসহ্য লাগিতেছে আজকাল। কারণ সম্প্রতি তুমি এমন কিছু পাইয়াছ যাহা আমার নাই।

তুমি আমাকে ঈর্ষ্যা কর বলিয়া আমি তোমাকে ঈর্ষ্যা করিতেছি না। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই জানি, তুমি আমাকে ক্রমান্বয়ে ঈর্ষ্যা করিয়া আসিতেছ। প্রীতিরেণু, আমি নির্ব্বোধ নই।

তুমি আমাকে ঈর্ষ্যা কর আমার সহজ ব্যবহারের জন্য, আমার মনোহারী বচন-বিন্যাসের জন্য, আমার সুগঠিত দেহের জন্য। তোমার আচারআচরণে জডতা, তুমি আমার মত চীৎকাব করিয়া হাসিতে পার না, তোমার লজ্জা হয়। তাহার জন্যও তুমি আমাকে ঈর্ষ্যা কর। তোমার ক্লাসঘরের পাশ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে যখন আমি হাঁটিয়া যাই, তখন দ্বারে দাঁড়াইয়া যে ছেলেটির সহিত গল্প কর তুমি, সে মুগ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া তোমার কথার উত্তর দিতে ভুলিয়া যায়। সুতরাং, হে প্রীতিরেণু দত্ত, সকল পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাইলেও তুমি আমাকে ঈর্ষ্যা করিতে পার।

আমার যাহা আছে তোমার তাহা নাই। তাই কখনও তোমাকে ঈর্ষ্যা করিবার হাস্যকর চিন্তা আমার মনে আসে নাই! কিন্তু, আজ আমি তোমাকে ঈর্ষ্যা করি, অত্যন্ত বেশী ঈর্ষ্যা করি। তোমার দিকে

তাকানো আমার সম্ভব নহে, তোমাকে দেখিলে আমার শরীর অস্থির লাগে, চিত্ত হাহাকার করিয়া ওঠে। তুমি যাহা পাইয়াছ আমার তাহা নাই।

আমার অনুদারতা, আমার নীচতা লইয়া উপহাস করিতে চাও কর, কিন্তু আমার সম্মুখে আর আসিও না। আমার ঈর্ষ্যা ঘৃণার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। কারণ?

"It is the cause, it is the cause, my soul, Let me not name it to you"—

কবে হইতে তোমাকে ঈর্ষ্যা করি, জানিতে চাও প্রীতিরেণু? বহুদিনের, অনেক সুখদুঃখের বন্ধু তুমি, তোমাকে বলিব। সেইদিন হইতে। আমার শয্যায় তুমি ও আমি অপরাহ্ণ বেলায় বসিয়া চা পান করিতেছিলাম। সম্মুখে কাঁচের ত্রিপদীতে চায়ের ট্রে—সাদা পাত্রে চা, রাধাবল্লভী আর সন্দেশ। সমস্ত ঘটনাটি চিত্রের মত চোখের সম্মুখে ভাসিয়া আছে। আবিষ্কারক কি নূতন রাজ্যে তাহার প্রথম দিনটি ভুলিতে পারে?

মিল্টনের তিনখানি সনেট-পড়া বিদ্যা লইয়া তুমি মিল্টনের কবি-প্রতিভার সম্যক্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে। তোমার মুখে সূর্য্যের শেষ সোনালী আলোকরেখা স্পর্শ করিয়া রহিল। তোমার গ্রীবা ও কেশের পশ্চাৎ হইতে শরৎকালের সুনীল আকাশ লঘু মেঘসম্ভারে হাতছানি দিতে লাগিল। সেইদিন তোমার সম্বন্ধে একটি বড় তথ্য আবিষ্কার করিয়া তোমাকে ঈর্ষ্যার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলাম।

তুমি অভ্যস্ত প্রাজ্ঞভঙ্গিতে বলিতেছিলে—"আচ্ছা, বলতে পার যারা প্রেম কোনদিন অনুভব করতে পারে না, তারাও কেন স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ

নিয়ে লেখালেখি করে? এত বেশী ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মিণ্টনের অক্ষমতাটা দেখ না।"

চায়ের পেয়ালা অধরে ধরিয়া অভ্যস্ত বিদ্রূপ হাস্যে তোমার কথা শুনিতেছিলাম। অবশেষে তুমিও প্রেম লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলে! আমার সহিত! তুমি, যাহাকে কোন পুরুষ, বন্ধুর আসন ভিন্ন প্রেমিকার আসন দিতে পারে না। আমি, যাহার দিবস ও রাত্রি অসংখ্য পুরুষপ্রেম-সঙ্কুল।

কিন্তু তোমার একটি কথা আমাকে কিঞ্চিৎ সচকিত করিল, বিদ্যুৎ-চমকের শিহরণে শুনিলাম তুমি বলিলে, "শুধু ভালবাসা পেলেই চলে না, ভালবাসতে জানাও চাই। ভালবাসা না পেলেও ক্ষতি নেই; ভালবাসতে না পারলে নিজেরই আত্মার অপূর্ণতা।"

অবশেষে এই কথা তোমার মুখ হইতে আসিয়া আমার আত্মপ্রীত নিশ্চিন্ত চিত্তে আঘাত হানিয়া গেল। সমস্ত জীবনে যে কখন স্বপ্ন দেখে নাই, দৈনন্দিন জগতের ঊর্দ্ধে যাহার দৃষ্টি ক্ষণতরেও উঠিতে পারে না, তাহারই মুখে এই কথা আমারই অবগতির জন্য সঞ্চিত ছিল? চায়ের পেয়ালা নামাইয়া উঠিয়া বসিলাম; অর্দ্ধপরিহাসে, অর্দ্ধপরীক্ষাচ্ছলে প্রশ্ন করিলাম—"প্রেম নিশ্চয় সম্প্রতি বুঝতে শিখেছ, নইলে এ সব কথা কেন?"

অপ্রতিভ লজ্জায় মরীয়াভাবে বলিলে, "হ্যাঁ ভাই। তোমাকে এত-দিন বলিনি। একজনের দেখা পেয়েছি।"

তখনও পরিহাস করিতেছিলাম, বলিলাম, "আচ্ছা, তা'হলে বলতে পার ভাল্‌বাসলে কেমন লাগে?"

অত্যন্ত আগ্রহের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর পাইলাম, "পারি, আমি এখন পারি।"

কি বলিতাম ভুলিয়া গিয়াছি। সহসা তোমার মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় আমি বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া গেলাম। তোমার ভাবলেশহীন, কুশ্রী মুখে কি অপরূপ সৌন্দর্য্য!

তখনি ঈর্ষ্যার সূচী আমাকে আপাদ-মস্তক বিদ্ধ করিল। ঈশ্বর, যদি একমুহূর্ত্তের জন্যও অমনি নির্ব্বোধের অন্ধ আবেগে, অমনি সর্ব্বগ্রাসী প্রেমে কাহাকেও ভালবাসিতে পারিতাম!

২

সাহিত্যিকা

আজও নিশীথ স্বপ্নের অবসানে মধুর তন্দ্রায় কানে ভাসিয়া আসিল করুণ একঘেয়ে বিষাদাচ্ছন্ন একটি সুর। ধীরে ধীরে সেই সুর শব্দে মূর্ত্তি গ্রহণ করিল—

Ramona, I hear the mission bells's ring···

···I bless you, I caress you—"

আমার মুদিত চক্ষের সম্মুখে ইতস্ততঃ তুলিক্ষেপে ছবি চিত্রিত হইয়া গেল—কোন বিদেশী তটিনার তীরে মিশনবাড়ীর ঘণ্টাস্পন্দন, উদাস-নয়নে কোন রামোনা? আমার সহস্র আশীর্ব্বাদও কোন রামোনাকে রক্ষা করিতে পারে নাই?

ক্ষুদ্র গৃহে অজস্র জনসমাগম। মৃত্যুর সম্মুখে মূক জনতা। শুভ্র পুষ্পে অধিকার আছে কিনা জানি না, তবু শয্যা তাহার সাদা ফুলে আবৃত। পাণ্ডু অধরে চিরাভ্যস্ত বিষণ্ণ হাসি, ক্লান্ত নয়ন নিমীলিত। জীবনে তাহাকে যাহারা ভালবাসে নাই তাহাদের চক্ষেও বন্যখণ্ড। কিন্তু আমারও চক্ষে অশ্রু কেন? একদিন তাহার মৃত্যু কামনা করিয়াছি, কিন্তু আজ তাহার মৃত্যুতে আমিও শোক করিতে আসিয়াছি।

চায়ের সময়। আমার রেকাবে জেলী-মাখানো রুটি দিতে দিতে সে গান গরিয়াছিল—"Ramona, I hear the mission bells's

ring"—সেই তাহার শেষ কণ্ঠধ্বনি আমার শ্রবণে প্রবেশ করিয়াছিল। তাই বোধহয় প্রভাত স্বপ্ন আমার ব্যাহত হয় বিদেশী সঙ্গীতের অস্পষ্ট গুঞ্জরণ-স্মৃতিতে। কিন্তু সে গাহিয়াছিল লঘু চাপল্যে, আর আমি শুনিতেছি বিষাদ-অশ্রুতে,—'রামোনা—'।

না, না, আমি তাহাকে ভালবাসি নাই। বাসিয়াছিলাম অসম্ভব বেশী। তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনে আমি ছিলাম একমাত্র অনাত্মীয় পুরুষ, যে তাহাকে বাসনার চক্ষে দেখে নাই।

প্রতুল ছিল ল ক্লাশে আমার একমাত্র বন্ধু। কিছু বেশী বয়সে আইন পড়িতেছিলাম। ।শং ভাঙিয়া বাছুরের দলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করি নাই। প্রতুল আমার পাশে বসিত। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে সে ব্যস্ত। আমার পুস্তকাদির সাহায্য তাহাকে লইতে হইত, কারণ, পুস্তক ক্রয় করিবার অর্থ তাহার প্রায় থাকিত না।

বই দেওয়া-নেওয়া করিতে প্রতুলের জীর্ণ একতালা বাটির সদর দ্বারে এক দিন তাহার সহিত আলাপ হইয়া গেল—"দাদা ছাত্র পড়াতে বেরিয়ে গেলেন। এই বইখানা আপনাকে দিতে বলে গেছেন।"

আমি অবিবাহিত যুবক, সুন্দরী তরুণীর সহিত প্রথম সাক্ষাতে উপন্যাস-বর্ণিত একটি নিগূঢ় অচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু, উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে আমার প্রভেদ এই যে, আমার বন্ধন প্রেমের নহে, অপরিসীম স্নেহের। মনে হইল, কত যুগ হইতে তাহাকে যেন আমার কত কি দিবার আছে, দেওয়া হয় নাই। মনে হইল, তাহার সুখ যেন আমার হস্তে নির্ভর করিতেছে। সে যেন আমারই পথ চাহিয়া আছে। অপরিচয়ের সঙ্কোচ আমার আগ্রহকে দমন করিয়া রাখিতে পারিল না। 'আপনি' শব্দের দ্বারা

ব্যবধান রচনা করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইয়া চলিবার উপক্রম করিতে প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"তুমি বুঝি প্রতুলের বোন? তোমার নাম কি?" সাহস সঞ্চয়ের প্রয়োজন ছিল না, সে আমারি পথ চাহিয়াছিল।

প্রতুলের ভগিনী জয়ন্তী দত্তের সহিত সেই আমার প্রথম আলাপ। কিছু দিন গেল। একদিন প্রতুল আমাকে সকুণ্ঠ ভাবে বলিতে আসিল—"তোমরা ব্রাহ্মণ, আমরা কায়স্থ, আর তাছাড়া আমরা বড গরীব। নইলে জয়ন্তীকে তুমি যে রকম ভালবাস, তাতে তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হলে খুব সুখী হতাম।"

শিহরিয়া উঠিলাম! জয়ন্তীর সহিত আমার বিবাহ? অসম্ভব। প্রতুল ভালবাসা দেখিয়াছে, তাহার রূপটি দেখে নাই। বলিলাম,—"ছিঃ, জয়ন্তীকে যে আমি নিজের বোনের মত ভালবাসি।"

দ্বিধায় আমার দিকে চাহিয়া প্রতুল বলিল,—"তাহলে তুমি ওর ভাই হলে?"

সবেগে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—"হঁ্যা, তাই! তাই!"

জয়ন্তীর ঘন পক্ষ্মসমাবৃত করুণ নয়ন দু'টি আমার বড় ভাল লাগিত। শ্যামল তনুদেহে, দীর্ঘ কৃষ্ণ অলকরাশিতে এবং পরিপূর্ণ ঈষৎ স্থূল অধরে তাহার যে রূপ লক্ষ্যগোচর হইত, তাহা পুরুষচিত্তে আকাঙ্ক্ষা-উদ্রেককারী। কিন্তু তাহার চোখের দিকে চাহিলে দেখিতাম, সরলা কিশোরীর অসহায় আত্মভোলা অন্তঃকরণের চিত্র। কখনও কখনও উদাস আত্মবিস্মৃত দৃষ্টিতে সে একদিকে চাহিয়া থাকিত। সে অন্যমনস্কতায় ডাকিয়া উত্তর পাই নাই। একদিন

তাহার এই ঘন ঘন আত্মবিস্মৃতি লইয়া পরিহাস করায় প্রতুল উচ্চহাস্য করিয়া বলিল—"জানো না প্রভাত, ও যে সাহিত্যিকা।"

—"সাহিত্যিকা?"

—"হ্যাঁ, গল্প লেখে, কবিতা লেখে। রাত্রে রোজ শোবার আগে কবিতা পড়ে শোয়। বড় বড় লেখকদের লেখা সমালোচনা করে। অবশ্য সমস্তই কাগজে কলমে। এখনও প্রকাশ হয়নি। নীরব সাহিত্যিকা।"

বলিলাম—"কেন জয়ন্তী? কাগজে পাঠালে পারো।"

সাগ্রহে আমার দিকে চাহিয়া জয়ন্তী প্রশ্ন করিল,—"তারা ছাপাবে?"

সেই আশায়-ভাস্বর-মুখের প্রতি চাহিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, জয়ন্তীর রচনা প্রতিটি পত্রিকা শোভিত করিবে, আমি তাহা সাধ্যায়ত্ত করিব। অর্থের অভাব আমার ছিল না।

—"এ কি?"

পুরুষকণ্ঠের স্থির, আত্মনিশ্চিত স্বর শোনা গেল—"প্রতিভা থাকলেও মেয়েরা সংস্কারমুক্ত হয় না, তার প্রমাণ তুমি। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না। আমি তোমাকে চাই। সে চাওয়ার সীমারেখা নেই। আলাদা কোরো না, শরীর আর প্রেম এক।"

—"না, না। আমি আপনাকে ভালবাসতে চাই। দয়া করুন।"

জলন্ত লৌহশলাকা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। জয়ন্তী,—আমার জয়ন্তী এই সমস্ত কথা শুনিতেছে—আমিই ছয় মাস পূর্ব্বে পরিচয় করাইয়া দিয়াছি—মণিবর্দ্ধনের মুখ হইতে। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ

সাহিত্যিক মণিবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায়। জয়ন্তী প্রত্যাখান করিতেছে, তবু কেন আমার বক্ষে অসহনীয় যন্ত্রণা? জয়ন্তী—আমার জয়ন্তী বলিতেছে সে ভালবাসিতে চায়। কাহাকে? মধ্যবয়স্ক, বিবাহিত মণিবর্দ্ধন। তাঁহার বচনবিন্যাস তাঁহার চরিত্রের যথার্থ পরিচয় দিবে।

চোরের মত আমি শুনিয়াছিলাম। চোরের মত অন্দরের দ্বার দিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছি। চৌর্য্যবৃত্তি আমার স্বধর্ম্ম। আজ সাহিত্যিক বলিয়া জয়ন্তীর খ্যাতি জন্মিয়াছে। আমার এক বৎসেরব সাধনায় গৃহাঙ্গনের তুলসীবৃক্ষকে আমি প্রকাশ্য রাজপথে রোপণ করিয়াছি। সাহিত্যিকগণের সাহিত্যিকার নিকট অবারিত গতির দাবী আছে। জয়ন্তী শুধু প্রতুলের ভগিনী, বৃদ্ধ পিতার কন্যা, আমাব অশেষ স্নেহপাত্রী নহে—সে বঙ্গ-সাহিত্যের।

মণিবর্দ্ধনকে কিছু বলিতে পারিলাম না, জয়ন্তী তাঁহাকে ভালবাসে। সাড়া দিয়া পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

জয়ন্তী প্রবেশ করিল। বিদেশী ভয়েলের বস্ত্র তাহার অঙ্গে, রুক্ষ চুল বাতাসে উড়িতেছে।

কি বলিতে কি বলিলাম?—"চুলে তেল দাওনা কেন জয়ন্তী?"

—"ও আমাকে মানায় না।"

—"তোমাকে কি মানায় আর কি মানায় না, সে সম্বন্ধে মতামতটা স্তাবকদের কাছ থেকে না নিয়ে আয়নার কাছ থেকে নিলেই পারো।"

—"কি হয়েছে আপনার প্রভাতদা, এত রাগ কেন?"

ওঃ! কথাও যেন জয়ন্তী বলিতেছে মণিবর্দ্ধনের অনুকরণে। সেই অধরের পার্শ্বে ব্যঙ্গ-হাস্য ও নয়নের তির্য্যক্ দৃষ্টি!

—"শোন জয়ন্তী, বোস। একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে। ও-ঘরে মণিবর্দ্ধন বাবু কি—?"

মুখ ফিরাইয়া অপ্রতিভ স্বরে জয়ন্তী বলিল—"চলে গেছেন।" জয়ন্তী আমার পায়ের কাছে একটা নীচু বেতের মোড়ায় বসিল।

—"ভবিষ্যতে কি করবে স্থির করেছ? সব কাগজে লেখা তো বার হলো। বিস্তর সভা-সমিতি করলে। এখন কি করবে বলো? ডিগ্রী নেই, সুতরাং চাকরী চলবে না। বাঙ্গালী মেয়ের যা অবশ্য কর্ত্তব্য তাই করো। বিয়ে করো, একটি সুপাত্র দেখি।"

সেই আত্মবিস্মৃত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া জয়ন্তী উত্তর দিল, —"না, বিয়ে আমি করতে পারব না। আমি সাহিত্য নিয়ে সারা জীবন থাকব।"

—"সাহিত্য শুধু হলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু, তার প্রধান আনুষঙ্গিকটি যে তোমাকে গ্রাস করতে চাচ্ছে।"

"প্রধান আনুষঙ্গিক? ওঃ। আচ্ছা প্রভাতদা; সাহিত্যেকেরা সকলে এত ভাল, তবু নৈতিক বন্ধন মানেন না। আমি কি খারাপ মেয়ে, যে ওঁরা আমার সঙ্গে অমনি করেন?"

—"তুমি খারাপ নও, অন্য রকম। নিজেদের মত না হলে ওঁরা মিশে স্বস্তি পান না।"

জয়ন্তীর সহিত কথা বলিতে বলিতে দুই দিন পূর্ব্বের একটি চিত্র আমার চক্ষে ভাসিয়া আসিল।

সঞ্জয় মিত্রের নূতন নাটকের প্রথম অভিনয়। জয়ন্তী নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। তাহার সঙ্গী হিসাবে আমিও গিয়াছিলাম টিকেট কাটিয়া। প্রতুলের অবকাশ ছিল না।

মধুলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায় সঞ্জয় মিত্র ও তাহার সাহিত্যিক বন্ধুবর্গ

জয়ন্তীর চতুষ্পার্শ্বে ভিড় করিয়াছিল। তরুণ, অবিবাহিত যুবক সঞ্জয়ের ব্যাকুলতা আমাকে তৃপ্তি দিয়াছিল, কারণ, সঞ্জয় জয়ন্তীর স্বজাতি।

আমার উপহার হীরকখচিত কর্ণাভরণ দোলাইয়া জয়ন্তী সঞ্জয়কে বলিতেছিল,—"ইস, কি ভাবেন আপনি আমাকে? একা আমি এখন আপনার সঙ্গে ময়দান থেকে ঘুরে আসতে পারি না?

সুপুরুষ সঞ্জয় মিত্রের বঙ্কিম অধরে হিসাব খতিয়ানের সতর্ক হাস্য দেখা দিল—"মিস্ দত্ত ভুলে যাচ্ছেন আপনাব অভিভাবকেরা এখানে উপস্থিত নেই। তাঁদের অনুমতি নেওয়া হল না। আপনি যে এখনও বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করেন না।"

সবেগে জয়ন্তী প্রতিবাদ করিল—"কখনও না। আমার অভি-ভাবকের মধ্যে বাবা আর দাদা। তাঁরা তো কোন কাজে আমাকে বাধা দেন না।"

—"দিলে ভাল করতেন জয়ন্তী দেবী! আপনি এখনও বড় ছেলে-মানুষ—" চুরটের ধুম্রজালের মধ্য হইতে চিন্তান্বিত মুখে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নরনারায়ণ রায় বলিলেন।

—"তাহলে নরনারায়ণ বাবুর অনুমতিটাই নেওয়া যাক। আধ ঘণ্টা বিরতি আছে, এর মধ্যে আমরা ঘুরে চলে আসছি। দেখি কেমন আপনার সৎসাহস।"

সম্মতি-প্রত্যাশার দৃষ্টিতে জয়ন্তী আমার প্রতি চাহিল।

ধীরে ধীরে বলিলাম,—"এখন আর যেয়ে লাভ কি জয়ন্তী? ঠিক সময়ে ফিরে আসতে পারবে না। সঞ্জয় বাবুর বই, উনি উপস্থিত না থাকলে ভাল দেখায় না। বাড়ী ফিরবার পথে নামলেই হবে।"

উচ্চ হাস্যের সহিত সঞ্জয় বলিল—"ওহো, এখানে যে প্রভাত

বাবু রয়েছেন সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। প্রভাত বাবু যে মিস্ দত্তের সব চেয়ে বড় অভিভাবক!”

উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে জয়ন্তী বলিল,—“হ্যাঁ, প্রভাতদা আমার নিজের দাদা না হলেও তারও বেশী।

একটা অপ্রীতিকর আব্‌হাওয়া আলোকোজ্জ্বল চতুষ্কোণ নাট্যগৃহের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

জয়ন্তীর কাল শাড়ী-ঢাকা পৃষ্ঠদেশে হস্ত রক্ষা করিয়া অবশেষে মণিবর্দ্ধন উঠিলেন,—“আচ্ছা জয়ন্তী, ময়দান অনেকটা দুর, কাছা-কাছিই না হয় চলো, এত বেড়াবার ইচ্ছা যখন তোমার। লবিতে এস। বড় তেষ্টাও পেয়েছে।”

মন্ত্রমুগ্ধা সর্পীর মত জয়ন্তী দীর্ঘাকৃতি মনিবর্দ্ধনের অনুগমন করিল। দেখিলাম, এবারে আমার অনুমতির অপেক্ষা করিতে হইল না। ইহাদের মধ্যে মণিবর্দ্ধনের জয়ন্তীর প্রতি আকর্ষণ কিছুটা ভিত্তির উপর স্থাপিত। তাই বড় ভয় হয়। কামনার আহ্বান জয়ন্তী উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু যেখানে বিন্দুমাত্র প্রেমের অনুপান মিশ্রিত আছে, সে বিষ যে তাহার সাহিত্যিক-চিত্তের অমৃত-রসায়ন।

—“তুমি সাধারণ মনোবৃত্তি দিয়ে সাহিত্যিকের বিচার করতে যেয়ো না জয়ন্তী, তাহলেই তোমার আসবে গোলমাল আর জটিলতা।”

শুনিলাম আমার কণ্ঠ শান্ত, অনুত্তেজিত নিয়মবদ্ধভাবে জয়ন্তীকে হিতোপদেশ দিতেছে। কিন্তু আমার চিত্ত ক্রমাগত বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে একটির পর একটি অতীত দৃশ্যে।

মাসখানেক পূর্ব্বে। দেখিয়াছিলাম জয়ন্তীর বাটীতে বৈকালিক

জনসমাগমের মধ্যে কি দীনতা-মিশ্রিত ব্যাকুলতা। ভিখারীর প্রার্থনা সকলেরি নয়নে, ভঙ্গিতে। চায়ের পাত্র লইবার অছিলায় লম্পট-চূড়ামণি অম্বর বসুর জয়ন্তীর হস্তধারণ। দেখিয়াছিলাম, সঞ্জয় মিত্রের হেলিয়া জয়ন্তীর দেহ স্পর্শ করিয়া অন্তরঙ্গ আলাপ। জয়ন্তীর বৃদ্ধ পিতা পাশের কক্ষে ভাগবতপুরাণ পাঠ করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সাহিত্য-আসরের অট্টহাসি শ্রবণ করিতেছেন। প্রতুল নিত্যকার মত ছাত্র পড়াইতে গিয়াছে। তাই সাহিত্যিক না হইলেও এই সমস্ত সাহিত্য-সভার এককোণে অপ্রতিভ হাস্য মুখে টানিয়া আমার বসিয়া থাকিতে হইত। বুভুক্ষ নেকড়ের পালের মধ্যে জয়ন্তীকে একা ফেলিয়া আমি যাইতে পারি না।

কাল আবরণীর মধ্য হইতে স্তিমিত আলোর দ্যুতি দরিদ্রগৃহের সামান্য আসবাবকে ধনিগৃহের উজ্জ্বলতায় শোভিত করিবার বৃথা প্রচেষ্টারত। সেই আলোর নিম্নে গৃহের একমাত্র সভ্য আসনে সোজা হইয়া বসিয়া নীরবে সমস্ত দেখিতেছেন—মণিবর্দ্ধন।

"High on the throne of royal splendour
Exalted Satan sat...."

ওই বিশাল নয়নে প্রকৃত প্রতিভার জ্যোতিঃ সন্দেহ নাই, উদার ললাটে জ্ঞানগরিমার চিহ্ন। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম-পাশ এড়াইবার শক্তি জীবনে কোনদিনই মণিবর্দ্ধন সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পান নাই। তাঁহার চারিপাশের দীনতা-লঘুতার মধ্যে অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে, রাজকীয় নিঃসঙ্গতায় তিনি সাধারণ সাহিত্যিকের পর্য্যায় হইতে বহু স্বতন্ত্র। তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহার এড়াইবার সাধ্য কাহারও নাই। মনে হইল, বায়সকুলের বিফল কলহ ও চঞ্চু আস্ফালনের উর্দ্ধে প্রদীপ্ত দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া রহিয়াছে শিকারী ঈগল। তাহার যখন যাহাতে

প্রয়োজন নিঃশব্দে সে তখনি সেটি সংগ্রহ করিবে। অবুত বায়সবৃন্দের বাধা প্রদান করিবার সামর্থ্য হইবে না।

শুনিলাম, মণিবর্দ্ধনের কথা বলিতেছি—"এই দেখনা মণিবর্দ্ধন বাবুকে। কত বড় প্রতিভা, কিন্তু রুচি বিকৃত। নয় কি?"

—"কিছুমাত্র নয়—" শুনিলাম, তীব্রকণ্ঠে জয়ন্তী প্রতিবাদ করিতেছে—"উনি প্রকৃতির নিয়মের ওপর মানুষের নিয়ম প্রচলিত করেন না। সমস্ত কিছুর আদি রূপটি ওঁর চোখে পড়ে, এমনি আশ্চর্য্য বুদ্ধি ওঁর, আপনি আমি এবং সাধারণ মানুষে মিলে বস্তুটির যে বিকৃত রূপ দিচ্ছি সেটা উনি গ্রাহ্য করেন না। বিকৃত রুচি আমাদের প্রভাতদা, ওঁর নয়।"

মনে হইল, সহসা যেন জয়ন্তী আমার নিকট হইতে কতদূরে চলিয়া যাইতেছে। যেন উভয়ের মধ্যে খরস্রোতা কোন অজানা তটিনী প্রবাহিতা। অস্পষ্ট কুয়াশাজালে জয়ন্তীর সর্ব্বদেহ যেন মণ্ডিত হইয়া গেল। আমার দৃষ্টি আর তাহাকে খুঁজিয়া পায় না। বিদেশিনী! আমার জগৎ বুঝি তাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। আজ মণিবর্দ্ধনের জগৎ তাহার জগৎ। 'আমরা' বলিয়া জয়ন্তী আমাকে আঘাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেও বুঝিলাম আজ আমরা অর্থাৎ আমি একা। মণিবর্দ্ধনের মতামতে আর জয়ন্তীর মতামতে পার্থক্য নাই। তাই চিরন্তন সংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া আত্মদানে অস্বীকৃতি জানাইলেও মণিবর্দ্ধনকে ভালবাসিবার পক্ষে কোন বাধা হইতেছে না। নদীর ওপারে বিদেশিনী জয়ন্তী, এপারে আমি। ঠিক্! কারণ আমি সাধারণ শ্রেণী-ভুক্ত, আর জয়ন্তী? জয়ন্তী সাহিত্যিকা!

জয়ন্তীদের গৃহপার্শ্ববর্তী মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আরতির ঘণ্টাধ্বনিতে চেতনা লাভ করিয়া শুনিলাম, আমারি শান্তকণ্ঠ বলিতেছে,—"সমাজে থাকতে হলে সামাজিক নিয়মগুলো স্থূলভাবে মেনে চলতে হয়। বুদ্ধির খেলা সেখানে চলে না। আদি বস্তুর ওপর যাঁর অত আকর্ষণ তাঁর মনুষ্য-সমাজ ত্যাগ করে অরণ্যবাসী হওয়া উচিত। যেগুলো করা উচিত নয় সেগুলো বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ না করে অন্ধভাবে মেনে চলাই কর্ত্তব্য।"

—"হৃদয় উচিত অনুচিত মেনে চলে না।"

চমৎকার! জয়ন্তীর সাধারণ সহজাত বুদ্ধি আজ কাব্যমদিরায় আচ্ছন্ন। আমাকে কঠোর হইতে হইবে।

—"তিনি বিবাহিত, সুতরাং কোন কুমারী মেয়ের সঙ্গে মিশতে হলে যতটা সংযম রক্ষা প্রয়োজন তা তিনি করছেন না।"

অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখভাব লক্ষ্য করিতে করিতে জয়ন্তী বলিল—"দোষ তাঁর একার নয়। বিবাহিত ব্যক্তির কথা কুমারী মেয়েরও বিবেচনা করা উচিত।"

—"জয়ন্তী, চুপ করো! মণিবর্দ্ধনের মনে সম্পূর্ণ প্রেম জাগাতে যে মেয়ে পারে, তুমি সে মেয়ে নও। তোমার লেখা অত্যন্ত ভাল হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত কোমল। এই চরিত্রগত কোমলতা তোমার সর্ব্বনাশ করবে।"

"—উনি তো আমাকে তাহলে বিয়ে করতেও প্রস্তুত আছেন—" বক্র কটাক্ষে আমার দিকে চাহিয়া জয়ন্তী উত্তর দিল।

শিহরিয়া উঠিলাম, বলিলাম—"জয়ন্তী, তুমি কোনও দুরবস্থায় পড়লে কি মণিবর্দ্ধনের কাছে কেঁদে দয়া ভিক্ষা করবে?"

অবিচলিত স্বরে জয়ন্তী উত্তর দিল,—"না, আত্মহত্যা করব।"

নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় মধ্যেও কোথাও অপরিসীম সান্ত্বনা পাইলাম। মণিবর্দ্ধন আমার জয়ন্তী সর্ব্বগ্রাস করিতে পারেন নাই। এখনও অবশিষ্ট আছে—তাহার আত্মসম্মান।

বলিলাম—"তারও প্রয়োজন হয় না। তোমার জয়ন্তী দত্ত নাম যদি তোমার পক্ষে যথেষ্ট হয়, তোমার যে কোনও সন্তানের পক্ষেও যথেষ্ট হবে। অনাহূত, অবজ্ঞাত যারা আসে, পৃথিবীতে তাদের দিয়েও প্রয়োজন আছে।

আমার সন্নিকটে জয়ন্তী সরিয়া আসিল, করুণা অনুশোচনায় তাহার ঘন-পক্ষ্ম নয়নে রাত্রির গভীরতা নামিল,—"কেন মন খারাপ করছেন আপনি? আমি কথা দিচ্ছি কিছুই হবে না।"

একটু নীরবতার পরে জয়ন্তী ধীরে ধীরে বলিল—"আপনার কিন্তু মণিবর্দ্ধন বাবুর ওপর একটা অহেতুক বিশ্রী ধারণা রয়েছে। জানেন, উনি হাতযোড় করে আমাকে তাড়াতাড়ি কোন সুপাত্রকে বিয়ে করতে অনুরোধ করেছেন। উনি যদি আমার হিতাকাঙ্খী না-ই হবেন তাহলে ও-কথা বলবেন কেন?"

"জয়ন্তী, সাহিত্যিক মনে দু'টো বৃত্তিই আছে। জান না, ধূলোয় বসে তাঁরা স্বর্গরচনার স্বপ্ন দেখেন? যে হাত সময়-বিশেষে পানপাত্র ধরার পক্ষেও শিথিল হয়, সেই হাত আবার অনবদ্য সঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারে। মণিবর্দ্ধন অন্তরে বাহিরে একজন প্রকৃত সাহিত্যিক।"

তাহার পর আর কিছু বলি নাই,শুধু দেখিয়া গিয়াছি এবং মনে মনে অর্থ করিয়া গিয়াছি। দেখিয়াছি, জয়ন্তীর উদাস কমল নয়নে শ্রান্তির নিবিড় প্রলেপ! দেখিয়াছি, সরল মনোহারী হাস্য জয়ন্তীর বিষাদ-মলিন! অধরের পার্শ্বে একটি দুইটি গভীর রেখাতে, কপোলের পাণ্ডুতাতে তাহার মানসিক সংগ্রাম প্রকট। প্রেমাস্পদের প্রেম

লালসাপ্রধান হইলে সে আহ্বান প্রেমিকার নিকট অমার্জ্জনীয়, অথচ ব্যাকুলতা তাহার অহর্নিশ ডাকিয়া ফেবে।

দেখিয়াছি, মণিবর্দ্ধনের সুদীপ্ত নয়নের তীব্রদৃষ্টি ক্রুদ্ধ সর্পের দৃষ্টির একাগ্রতায় জয়ন্তীকে অনুসরণ করিতেছে! উজ্জ্বলতা তাঁহার নয়নে দ্বিগুণ হইয়াছে, যেন কোন অনির্ব্বাণ অনল তাঁহাকে জ্বালা দিতেছে।

প্রতুলকে এক দিন আমার নির্জ্জন বাটীতে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম,—"আর দেরি কোর না। জয়ন্তীর বিয়ে এখন না দিলেই নয়। চেনা-জানার মধ্যে ঐ সঞ্জয় মিত্র লোকটি বেশ! আসা-যাওয়া করছেন খুব, জয়ন্তীর ওপর মন আছে। ওর কাছে তুমি নিজে যেয়ে প্রস্তাব করো।"

দ্বিধার সহিত প্রতুল বলিল,—"কিন্তু, বিয়ে কোথেকে দেব? বাবার পেন্সনের টাকা আর আমার ছাত্রপড়ানো! এতে কোনমতে খরচ কুলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিয়ে! আর, তাছাড়া বিয়ে করতে জয়ন্তী রাজী নয়। তার অমতে—

বাধা দিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিলাম—"সে জন্য ভেব না। টাকা আমি দেব। ধার নিও, পরে উকীল হয়ে শোধ দিও। আর জয়ন্তীকে রাজী করাবার ভার আমার। কালই সঞ্জয়েব বাড়ী যাও।"

প্রতুল বিবাহ-প্রস্তাব লইয়া জয়ন্তীর সাহিত্যিক বন্ধু ও স্তাবকের নিকট গিয়াছিল। সঞ্জয় মিত্র যথাযোগ্য সমাদরের পর প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকা জয়ন্তী দত্তের ভ্রাতাকে জানাইলেন, যে উক্তা মহিলার সহিত বিবাহের কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। প্রভাত বাবু যাঁহার পাণিপ্রার্থী, স্বয়ং মণিবর্দ্ধন বাবু যাঁহার প্রেমপ্রার্থী, তাঁহাকে বিবাহ করিবার দুঃসাহস কোন নবীন নাট্যকারের থাকে না।

—"এ-সব কথা আমার ভাল লাগে না।

—"আমি রক্তমাংসের মানুষ, পাথরের দেবতা নই। কেন আমাকে নিয়ে সময় কাটাতে চাও তুমি? আমাকে মুক্তি দাও, জয়ন্তী।"

—"আপনার কাছে কিছু চাই না, শুধু একটু আমাকে ভালবাসুন। কেউ আমাকে ভালবাসে না।"

খণ্ড-খণ্ড কথার অংশ আবার আমার কর্ণে প্রকাশ করিল, আবার মনে হইল, আমার হৃদয় যেন বেদনায় রক্তমোচন করিতেছে। মণিবর্দ্ধনের এই সমস্ত কথা, জয়ন্তীর করুণ স্বর কোথাও যাইয়া ভুলিতে পারি না। নিষ্ঠুর ঘাতকের নৃশংসতায় এই সমস্ত বচনাবলী আমাকে অনুসরণ করিয়া ফেরে। যাহার সামান্য সুখের নিমিত্ত সমগ্র জীবন তাহার পদতলে আস্তৃত করিয়া দিতে পারি, তাহাকেই এক জন অসহ্য যন্ত্রণা দিতেছে। পুরুষের প্রবল আকর্ষণের সহিত তাহাকে অহরহ সংগ্রাম করিতে হইতেছে। তাহাকে!—যাহার নয়নের ঈষৎ বিষাদ-নিমীলনও আমি চাহিয়া দেখিতে পারি না।

আমার তাগিদে প্রতুল অস্থির হইয়া উঠিল। পরিচিত সাহিত্যিকদের মধ্যে স্বজাতীয় পাত্র অন্বেষণ প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। জয়ন্তী সাহিত্যিকা, সাহিত্যিক মণিবর্দ্ধন তাহার হৃদয় হরণ করিয়াছেন। অন্য কোন সুযোগ্য সাহিত্যিক আনিয়া ধরিলে কিশোরীর ভুলিতে হয়তো বেশীক্ষণ লাগিবে না।

দিনে দিনে জয়ন্তার পরিবর্ত্তন দৃশ্যমান হইতে লাগিল। বাঙ্গালী মেয়ের সহজাত নম্রতা, তাহার নিজের চরিত্রগত ভীরুতা কিছু যেন আর তাহাকে বন্ধন দিতে সক্ষম হইতেছে না। প্রখর বেশভূষায়,

অনর্থক বাক্যের জালে নিজের স্বকীয়তাকে আবৃত করিয়া চিত্রাঙ্গদার তপস্যা তাহার চলিয়াছে। আয়ত নয়নকে কজ্জলশোভায় চিত্রিত করিতে যাহার সঙ্কোচ হইত, আজ বৈদেশিক বর্ণপ্রলেপে দেহ রঞ্জিত করিয়া সে বিদেশিনী সাজিতেছে। ইংরেজির অধ্যাপক লম্পট চূড়ামণি অম্বর বসু তাহাকে ইংরেজি-সাহিত্যে পাঠ দিতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারি প্রবাসকালে অভ্যস্ত ইংরেজি গীতিসমূহ কাজে অকাজে জয়ন্তীর মধুর কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল, আজও স্বপ্ন জাগরণে একটি সঙ্গীত শুনি—

"Ramona ! —I bless you, I caress you !"

একটা সন্দেহ কিছুদিন হইতে হইতেছিল। অবশেষে স্পষ্টতঃ জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম,—"জয়ন্তী, বহু দিন মণিবর্দ্ধন বাবুকে দেখি না যে ? কি ব্যাপার বল তো ?"

—"আমি আসতে নিষেধ করে দিয়েছি।"

এক মুহূর্ত্তে আমার কাছে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল। নিজের মনে অর্থ করিয়া লইলাম, তবে জয়ন্তীর এ তপস্যা আত্মবিস্মৃতির জন্য নহে, কাহাকেও ভুলিবার জন্য।

—"জয়ন্তী, কি হয়েছে ? এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে ?"

আমার মুখের প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া জয়ন্তী উত্তর দিল—"সঞ্জয় বাবুর ফ্ল্যাটে। ওঁর নতুন নাটকের প্রথম দৃশ্য শোনাবার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। দাদা কলেজ থেকে ফিরবার আগেই চলে গিয়েছিলাম। অবশ্য নাটক আর শোনা হল না।"

"—জয়ন্তী, এসব কি বলছ তুমি?"

তেমনি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া জয়ন্তী বলিতে লাগিল, "ঠিকই বলছি প্রভাত দা। যথার্থ সাহিত্যিক হবার পক্ষে শুনি সবচেয়ে বড বাধা নৈতিক বন্ধন। সকলেই তাই বলে। সেইটাই আজ ঘুচিয়ে দিয়ে এলাম। অম্বর বাবু এসব ক্ষেত্রে নিজেকে উদ্দেশ করে কি বলেন শুনবেন? "Oh Lucifer, Son of the Morning! How fallen thou art!"

"—জয়ন্তী, একবার বলো তুমি মিথ্যা বলে আমাকে পরীক্ষা করছ?" জয়ন্তীর অধরপার্শ্বে কঠিন হাস্য দেখা দিল, "আপনাকে পরীক্ষা করবার আমার কি প্রয়োজন, প্রভাত দা? আপনাকে কথা দিয়েছিলাম মণিবর্দ্ধন বাবুর বিষয়ে। সে কথা আমি রেখেছি। এবারে মণিবর্দ্ধন বাবুকে পুনরাহ্বান করা যেতে পারে।"

"—জয়ন্তী, তুমি কি জান, এই সঞ্জয় তোমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেছে?"

ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে জয়ন্তী উত্তর দিল—"তাতে কি হয়েছে? ভাল না বাসলে কেউ কি বিয়ে করতে চায়? কেউই তো আমাকে ভালবাসেনি, শ্রদ্ধা করেনি—আপনিও নয়।"

নিমিষে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখনি মনে মনে তাহার মৃত্যু-কামনা করিলাম।

দুইমাস পরের ঘটনা। প্রতুলদের বাড়ীতে অপরাহ্নের সময়ে আসিয়াছি, আসন্ন আইন-পরীক্ষা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার পরে যে কথা সর্ব্বদা আমার মনে জাগরূক সেই কথা তুলিলাম। জয়ন্তীর বিবাহের কথা।

বিষণ্ণ ভাবে প্রতুল বলিল, "তোমার তাগিদে যথাসাধ্য চেষ্টা তো করছি। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! যারা ওর সঙ্গে একটু কথা বলবার জন্যে পাগল, তারাও বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। এই সাহিত্যিকেরা বিশেষ ভাল লোক নয়, প্রভাত। এদিকে পরস্ত্রীর কাছে উদার মতবাদের পরাকাষ্ঠা, অথচ বিয়েব সময়ে একটি অশিক্ষিতা অসূর্য্য-স্পশ্যা! আধুনিক মেয়েরা না কি অত্যন্ত বিলাসী, আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য তাদের দ্বারা সম্ভব। তাই তাদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা চলতে পারে, বিবাহ নয়।"

উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম,—"সাহিত্যিক রসাতলে যাক্। এমনি সাধারণ ঘরে চেষ্টা করো না। যত টাকা লাগে দেওয়া যাবে। এত বড় বোন গলায় করে বসে আছ কোন্ বিবেচনায়?"

বিস্মিত প্রতুল বলিয়া উঠিল, "কি বলছ, প্রভাত? সাধারণ ঘরেও কি চেষ্টার ত্রুটি রাখছি! জয়ন্তী দেখতে ভাল, পাশ না করলেও রীতিমত শিক্ষিতা, কত বড় লেখিকা তার ওপরে! ওর কেন যে বিয়ে হচ্ছে না!"

জয়ন্তীর ভাগ্য-বিধাতার উপর নিস্ফল ক্রোধ জীবনে প্রথম সেদিন জয়ন্তীর সম্বন্ধে কতকগুলি রূঢ় কথা আমারই মুখ দিয়া বহির্গত করাইল—"লেখিকা! লেখিকা হয়েই তো মাটি করেছে। সাহিত্যিকা শুনলে সকলেই ভয় পায়, সাহিত্যিকেরা পর্য্যন্ত। ও হাতী পুষবার ক্ষমতা অনেকেরি নেই কি না। কি ভুল করেছি আমি ওকে সাহিত্যিক হবার সুযোগ দিয়ে। তবে, আমার ধারণা ছিল না যে জয়ন্তী স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাবে। ছি, ছি, পশুর জীবন যাপন করার চেয়ে মরাও ভাল। আজকাল একটু এসব দিকে চোখ রেখ, প্রতুল। যখন তখন যেখানে সেখানে জয়ন্তী একা যাচ্ছে, রোজ

বাড়ীতে যে সে এসে সাহিত্য সভা জমিয়ে তুলছে। এসব দেখলে কোন্ ভদ্রসন্তান সে মেয়েকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে রাজী হতে পারে? ওই মণিবর্দ্ধনটা আবার এসে জুটেছে। ওর দ্বারাই সর্ব্বনাশ হবে। যে মেয়ের চরিত্রে এতটুকু দৃঢ়তা নেই তাকে কি এমন করে ছেড়ে দিতে হয়?"

„—মণিবর্দ্ধন বাবুর সঙ্গে তো তুমিই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে, প্রভাত। জয়ন্তীকে একমাত্র উনিই বুঝতে পারেন। উনি সাধারণ নন।"

রুক্ষ স্বরে বলিলাম, "স্বীকার করা যাচ্ছে যে মণিবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় একজন বোদ্ধা ব্যক্তি। তবে জয়ন্তী যেমন হৃদয়াবেগ সংবরণ করতে পারে না, উনিও তেমনি শারীরিক চাঞ্চল্য নিবৃত্ত করতে পারেন না। উভয়েই সাহিত্যিক কি না। উনি অসাধারণ বলেই তো ভয়। তাই তো জয়ন্তীকে মণিবর্দ্ধন একেবারে বিক্ষিপ্ত করে ফেলেছেন। তুমি কি কিছুই বোঝ না, প্রতুল?"

চকিত ভাবে আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া প্রতুল অন্যমনস্ক স্বরে বলিল "অনেক কিছুই বুঝি, প্রভাত। কিন্তু বুঝলেই বা আমার কি করবার আছে? তবে একটা কথা বলি, রাগ কোর না। অনেক দিন আগে কথাটা তোমাকে একবার বলেছিলাম। আমার মনে হয়, জয়ন্তীকে তুমি বিয়ে করলেই সমস্ত দিক থেকে ভাল হয়। তুমি তো ওর সব জান। বাইরে যা হোক, ভেতরে ওর এতটুকু পাপ স্পর্শ করেনি।"

বাধা দিয়া উগ্র কণ্ঠে বলিলাম—"অসম্ভব। জয়ন্তীকে আমার বিয়ে করা অসম্ভব! তাছাড়া, জয়ন্তী রাজী হবে না। জানি জয়ন্তীকে পাপ স্পর্শ করেনি।"

প্রতুল ধীরে ধীরে বলিল,—"তোমার যত বুদ্ধিই থাক প্রভাত, মাঝে মাঝে ভুল হয়। জয়ন্তী আমার বোন, আমি তাকে জানি। তোমার সঙ্গে বিয়েতে সে রাজী হবে। অবশ্য তুমি যদি তাকে ভাল না বাস—"

এ আলোচনা আমার পক্ষে অসহ্য। অতি রূঢ় ভাবে বলিলাম—"জয়ন্তী, রাজী হলেও আমি রাজী হব না। ভালবাসার একটা রূপই তোমরা দেখেছ চিরকাল। ভালবাসা! আচ্ছা, তবে জেনে নিশ্চিন্ত হও—জয়ন্তীকে আমি ভালবাসি না।"

পার্শ্বের কক্ষ হইতে জয়ন্তী আসিয়া দাঁড়াইল। সেই রুক্ষ কেশে অর্দ্ধাবৃত মুখে চিরাভ্যস্ত করুণ হাসিটি! ভীত দৃষ্টিতে প্রতুলের প্রতি চাহিলাম। তবে কি জয়ন্তী পাশের ঘর হইতে সব কথা শুনিয়াছে? অথবা এই মাত্র সে বাহিরে আসিল?

আমার সংশয়ের মীমাংসা করিয়া লঘুকণ্ঠে কথা কহিল জয়ন্তী,—

"পাশের ঘরে বসে জেলি তৈরী করতে করতে আপনাদের তর্ক শুনছিলাম। জেলি দিয়ে রুটি-চা না খেয়ে চলে যাবেন না, প্রভাত দা।"

জয়ন্তীর আত্মহত্যার কারণ তখনি বুঝিতে পারি নাই। উপন্যাস-বর্ণিতা নায়িকার মত সে কোন পত্র রাখিয়া যায় নাই। সে মরিল আমার সহিত কথাবার্ত্তায় উল্লেখিত কোন বিপদে পড়িয়া অথবা মণি-বর্দ্ধনের সম্পর্কে আমাকে যে কথা দিয়াছিল তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, বুঝিলাম না। অথবা জীবনে তাহার বাঁচিবার প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছিল? তখনি বুঝিতে পারি নাই।

প্রচার করা হইল, এশিয়াটিক কলেরায় সুবিখ্যাত লেখিকা জয়ন্তী

দম্ভের তিরোভাব ঘটিয়াছে। শুভ্র পুষ্পে আচ্ছাদিত তাহার শবদেহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শেষবার প্রতুলের জীর্ণ বাটীতে সাহিত্যিক-সমাগম হইল। এক পাশে দাঁড়াইয়া আমি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ইহার মধ্যে কাহার জন্য জয়ন্তী মরিয়াছে। বোঝাপড়া আমাকেই যে করিতে হইবে।

মণিবর্দ্ধন! সহস্র শিকারীর দৃষ্টি চক্ষে লইয়া আমি তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম।

অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে মণিবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় মৃতার অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া নত হইয়া তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলাম তাহার নয়নে অপরিসীম করুণা। তাহারপরেই মুখ ফিরাইয়া তিনি স্থিরদৃষ্টিতে একবার আমার প্রতি চাহিলেন। ক্ষমাহীন নীরব ক্রোধের দৃষ্টি। স্বাভাবিক ঔদাস্যের সহিত মণিবর্দ্ধন গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

নিমেষে সমস্ত বুঝিলাম। প্রতুলের অসংখ্য ইঙ্গিতে, জয়ন্তীর নিঃশব্দ অভিমানে যাহা এতদিন বুঝিতে পারি নাই, মণির্দ্ধনের ক্ষণিক দৃষ্টি-ক্ষেপে তাহা আর আমার অজানা রহিল না।

জয়ন্তীর জীবনে প্রথম অনাত্মীয় পুরুষ আসিয়াছিলাম আমি। জন্ম-লগ্নে অনপনেয় কলঙ্করেখায় ললাটদেশ রঞ্জিত করিলেও বিধাতা অনন্য-সাধারণ রূপ ও স্বাস্থ্যপ্রাচুর্য্যে আমার দেহ ভূষিত করিয়াছিলেন, প্রাণে অনন্ত ভালবাসা দিতেও কার্পণ্য করেন নাই। সেই প্রেম স্নেহের প্রলেপে আবৃত করিয়া জয়ন্তীর কোমল কবিচিত্তের নিকটে দুই হস্তে আমি উপহার আনিয়াছিলাম। মাতৃস্নেহ বঞ্চিতা কিশোরী ভালবাসি-য়াছিল—আমাকেই।

আমার নিকটে সে আশ্রয় পায় নাই। আর আমার মনে কোন

দ্বিধা নাই! আমি বুঝিয়াছি, কোন বেদনা তাকে অস্থির করিত। অন্যের বাহু-বন্ধনে সে কেন তৃপ্তি খুঁজিয়া মরিত। যে প্রেম আমি অন্তরের একপার্শ্বে অযত্নে চাপিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই প্রেম নব ছন্দো-জালে গাঁথিয়া মণিবর্দ্ধন তাহাকে শুনাইয়াছেন। তাঁহার নিকট সে শুধু সান্ত্বনা চাহিয়াছে, ভালবাসিয়াছে আমাকে।

পিতৃ-পরিচয় দিবার অধিকার লাভ করি নাই। আমার কলঙ্কিত জীবনের সহিত তাহাকে যুক্ত করিব না ভাবিয়া দূরে দূরে থাকিয়া তাহার ধ্বংস আমি আনিয়া দিলাম। আমার অযাচিত স্নেহকে প্রতুল ও তাহার ভগিনী দরিদ্রের প্রতি ধনীর করুণা বলিয়া ভুল করিয়াছিল। আমার মুখের কথায় আমি ভালবাসি না বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম।

ভুল একমাত্র আমি করিয়াছি। মানুষের তুচ্ছ সমাজ-জালে আচ্ছন্ন, নির্ব্বুদ্ধি আমার দৃষ্টি অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মণিবর্দ্ধনকে সে ভালবাসে এ ভুল কেন করিয়াছিলাম? কতদিন দেখিয়াছি, আমার নয়নে আকুল আমন্ত্রণ। তবু আমি নীরব হইয়া ছিলাম।

যে আমার অন্তরাত্মা, তাহাকে স্বহস্তে আমিই হত্যা করিয়াছি!

অনার্য্য প্রেমিক

বৃক্ষ···শাল, আম, দেবদারু।

পুষ্প···গুলঞ্চ, কুর্চি।

দৃশ্য···পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত সাঁওতাল প্রদেশ।

এই পটভূমিকায় এক দ্বিতলবাটীর সম্মুখে রেণু বিচরণ করিতেছে। ক্ষীণাঙ্গী, অনুজ্জ্বল-গৌর তাহার গাত্রবর্ণ। বামহস্তে কাব্যপুস্তক। কালোচুলে ঈষৎ অযত্নে ও অনেকখানি যত্নে স্থাপিত পুষ্পগুচ্ছ। কৈশোর বহুদিন গত হইয়াছে। আজ তাহার যৌবনের অবসান, নিসঙ্গ···একক।

* * * *

রেণুকা দেবী পদযুগল শালে আবৃত করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়, পার্শ্বস্থ ত্রিপদীতে 'টেবেল ল্যাম্প' জ্বলিয়া উঠিল। অস্পষ্ট, ম্লান আলোকে গৃহখানি স্বপ্নতন্দ্রাজড়িত রহস্যাগারের রূপ ধারণ করিয়াছে। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে দক্ষিণাবাতাসে উগ্র চম্পকসুবাস ভাসিয়া আসিতেছে।

বহুদিন, বহুদিন এ কাহিনী শুনিতেছি; জানি আরও আমাকে শুনিতে হইবে, যতদিন রেণুকা দেবী জীবিত থাকেন। এইরূপ কত আমার কর্ম্মক্লান্ত অবসর-সন্ধ্যা রেণুকা দেবীর রৌপ্যখচিত অলকে বিজলি বাতির মুমূর্ষু-দীপ্তি দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গিয়াছে। দূর উদ্যানের সৌরভ ভাসিয়া আসিয়াছে বৃথা। বৃথা আমার প্রিয়া প্রদীপ্ত আঁখির নীরব ইঙ্গিত পাঠাইয়াছে। রেণুকা দেবীর সহস্রখ্যাত উপাখ্যান আমার বহুবার শুনিতে হইয়াছে। উপায়ান্তর নাই। রেণুকা দেবী আমার

প্রিয়ার অভিভাবিকা। আমি তাঁহাকে সারাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছি নিজের চিকিৎসায়।

তাঁহার দৃশ্যতঃ ব্যাধি বাত। অন্তরাল ব্যাধি অত্যধিক কাব্যচর্চ্চা এবং তাহার সহিত সেই অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত চিরকৌমার্য্য।

"বড় যন্ত্রণা হচ্ছে, ইন্দ্র, আর সহ্য হয়না!" রেণুকা দেবী দক্ষিণপদ আকুঞ্চিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধ্যবয়স্কসুলভ মলিন মুখমণ্ডল মলিনতর হইল,—"মনে হয় কে যেন চিবিয়ে খাচ্ছে! কেন সারছেনা ইন্দ্র? একটা অন্যায় করেছিলাম জীবনে, এ তার-ই শাস্তি।"

ঔষধের ব্যবস্থা আমার করিতে হইল না, রেণুকা দেবী নিজেই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আবার সু-অভিনীত আগ্রহে চেয়ারখানি সরাইয়া আনিলাম; বলিলাম, "না না, অন্যায় করেননি আপনি, ভুল করেছিলেন মাত্র। ভুলের অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে।"

"ভুল করবার বয়স আমার তখন ছিল না। আমি তখন বত্রিশ।"

* * * *

সাঁওতালী প্রদেশের হাটের দিন। কতলোক রেণুদের বাটীর সম্মুখ দিয়া চলিতে লাগিল ক্রীত দ্রব্যের বোঝা লইয়া। দূর পাহাড়ের উপর তাহাদের গ্রাম। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, আকাশের অন্যপার্শ্বে সদ্যসাগত চন্দ্র। সূর্য্যের খরপ্রভায় সে চন্দ্র নিষ্প্রভ হইলেও স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান। কি আশ্চর্য্য, একই আকাশে সূর্য্য ও চন্দ্র!

সাঁওতালী দাসী সুকী চায়ের পাত্র হাতে রেণুকে দিতে আসিল। একদল সাঁওতালী মেয়ে একঘেয়ে সুরে কি একটা দুর্ব্বোধ্য গান করিতে করিতে ফিরিয়া চলিয়াছে। তাহাদের দিকে ইঙ্গিত করিয়া রেণু সুকীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওইরকম গান তুমি করতে পারো? কি বলছে ওরা?"

'বোনদিদি' রেণুর হাতে চায়ের পাত্র দিয়া সুকী একটু কৃতিত্বের হাসি হাসিয়া জানাইল, সে সমস্ত গীতই জানে, প্রয়োজন হইলে এখনই গাহিতে পারে।

প্রয়োজন হইল। বারান্দার সিঁড়িতে বসিয়া সুকী ভাঙা-ভাঙা গলায় একটানা সুরে গান ধরিয়া ফেলিল—

"শালবন রাজদ বাহা বাগাওয়ান,
বারটি পাঁচিলী বাহা বাগাওয়ান।
দারে মা লিক লিক
বাহা মা লাক্ লাক্
চেক' তিন তিউগা হেকা কারাম ডোর।"

রেণু হাসিয়া উঠিল,—"এ আবার কি রকম সব কথা? এর মানে কি?"

বাঙালীবাবুদের বাড়ী কাজ করিয়া সুকী নানা বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং রৌপ্যবলয় আন্দোলিত করিয়া সে রেণুকাকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইল,—"শালবনে রাজাদের ফুলের বাগান আছে। বারটি পাঁচিল দিয়ে বাগান ঘেরা। একজন মেয়েমানুষ সেই ফুল নিতে চাইলো। মরদমানুষ বল্লো নিওনা, নিওনা। কিন্তু ফুল দেখলেই নিতে সাধ হয় কি না, তাই মেয়েমানুষ ফুল তুলে নিল।" বক্তব্য শেষ করিয়া সুকী তুলনামূলক সমালোচনা করিল বেপরোয়া ভাবে—"আমরা মেয়েমানুষ হচ্ছি মরদমানুষের কাছে ফুলের সমান।"

কিন্তু প্রাচীর তোমাদের নাই। সাঁওতালী-প্রেমে শ্রীক্ষেত্র নিত্য বিরাজমান। বাছবিচার নাই, বন্ধনের অবকাশ নাই। সমস্ত দিন কাজ, সন্ধ্যার পর হাঁড়িয়া, মাদল আর প্রেম। জীবনের পরম সত্য তোমরা জানিয়াছ—রেণু মনে মনে বলিল। যাহা হাতে পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করো—

"Strech forth your open hands and while yo live
Take away all the gifts that death and life may give."

মরিসের কবিতার দুইটি পংক্তি অজানিতে কে যেন রেণুর কাণে কানে বলিয়া দিল।

"বোনদিদি, বাংলা গীত শুনবে? উ আমি জানি।

আসবে বলে দূত পাঠালে
শুধু শুধু রাত জাগালে,
এবার বঁধু ঠিক সময়ে আসবে তুমি, ফুলকুমারী।"

"এ গান কোথা থেকে শিখলে সুকী?"

সুকী সগর্ব্বে উত্তর দিল পাহাড়ের উপর তাহাদেব গ্রামের 'মাস্টার' এই গীত বাঁধিয়াছে। সে 'মেট্রিক' পাশ এবং বড় কবি।

সাঁওতাল বাংলা গান লেখে এবং মেট্রিক পাশ স্কুলমাষ্টার শুনিয়া রেণু কৌতুহলী-চিত্তে সুকীকে সাগ্রহ প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইল যে মাষ্টার জাতিতে সাঁওতাল হইলেও শৈশবে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার আত্মীয়স্বজন কেহ নাই। মিশনারী ইস্কুলে সে শিক্ষকতা করে এবং গান বাঁধে। এই পথ দিয়া সে প্রতি হাটবারে হাটে যায়। আজও যখন বোনদিদি এখানে বেড়াইতেছিল সে গিয়াছে।

"আরও একটি গীত শুনবে, বোনদিদি? মাস্টার বেঁধেছে? উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সুকী উচ্চকণ্ঠে গাহিল—

"শালের বনে হাওয়া লাগে"—

ত্রিতল হইতে রুক্ষ, ভারী গলায় আদেশের ভাবে আহ্বান আসিল—

"রেণু!" রেণুর অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরিয়া জবরদস্ত রায়সাহেব পিতার কণ্ঠস্বর। সারাজীবন তিনি রেণুকে শাসন করিয়া আসিতে-

ছেন। ভদ্রবাটীর মান সম্ভ্রম ও কুমারী কন্যার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা আশ্চর্য্যভাবে সীমানিবদ্ধ।

সুখী জিভ কাটিয়া বিরত হইল। রেণু বিষণ্ণ সঙ্কুচিতচিত্তে উপরে উঠিয়া গেল।

"ঝি-চাকরের সঙ্গে সখীত্ব না করলে কি তোমাদের চলে না? ভদ্রঘরের মেয়েরা কেউ করে নাকি?" বাতদুষ্ট পদদ্বয়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে রায়সাহেব কন্যাকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিলেন,—"যাও, গরমজলের বোতলটা নিয়ে এসো।"

বাতব্যাধি রেণুদের বংশগত রোগ।

* * * *

"ইন্দ্র, এই অসুখটা যে এত কষ্ট দেয় কে জানতো আগে? বংশের ভাল কিছু পেলাম না, মন্দটাই পাচ্ছি। রেখা গেল কোথায়? ফ্ল্যানেল্‌টা দিয়ে যাক্।" রেণুকা দেবী বিরক্তি-জড়িতকণ্ঠে বলিলেন।

ফ্লানেল-খণ্ড আমি পাতিয়া বসিয়াছিলাম। কিন্তু রেখাকে একবার দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে ডাকিলাম।

সে আসিল, যেমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার অন্তরের অন্তস্তলে সে প্রবেশ করিয়াছে, তেমনি করিয়া আসিল।

"দিদি, ডাকছো?"

"রেখা, ফ্ল্যানেলটা—"ফ্ল্যানেল পাওয়া গেল। রেণুকা দেবী বলিলেন, "চা-টা এনে ইন্দ্রকে দাও রেখা। ডাক্তার মানুষ, সারাদিন পরিশ্রম করে।"

রেখা চলিয়া গেলে আমার দিকে চিন্তিত দৃষ্টি হানিয়া রেণুকা দেবী বলিলেন, "ইন্দ্র, তুমি বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছ বুঝেছি। রেখারো বয়স হয়েছে। কিন্তু, আমার অসুখ একটু ভাল না হলে তোমাদের

কি করে বিয়ে দেব, বলো ? মা তো ওর জন্মের সঙ্গে মারা যান, আমিই ওকে মানুষ করি। অবশ্য বিধবা হবার পর থেকে পিসীমাও আমাদের বাড়ী আছেন। বাবা মরবার সময়ে আমারি হাতে তুলে দিয়েছেন ওকে। আরতো আমাদের ভাই বোন নেই, সর্ব্বদা একসঙ্গে থেকে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। ও চলে গেলে আমার মুখে জল দেবার লোক থাক্‌বে না। টাকায় কি সেবাযত্ন মেলে ? আমার অসুখ ভাল না হ'লে রেখাও বিয়ে করতে চাচ্ছে না।"

চমৎকার ! যেমন তুমি, রেণুকা দেবী, তোমার পিতার সেবা-শুশ্রূষার ভার লইয়াছিলে, তেমনি আজ রেখাও আত্মত্যাগ করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু এ-আত্মত্যাগ স্বেচ্ছায় নহে, বাধ্য হইয়া—উভয় ক্ষেত্রেই।

রেণুকা দেবী, আজো দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে, আজো চন্দ্রের প্রভা তোমার অলক স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু, আজ তোমার দেহে প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত্র-আবরণ, তোমার কেশে রৌপ্যঝলক। সময়কে বহিয়া যাইতে দিতে নাই। নিজে যাহা উপভোগ করিতে পারিতেছ না, কেন রেখাকে তাহা করিতে দিতেছ না ? প্রেতের আবির্ভাব সুস্পষ্ট দেখিতেছি। মৃত রায়সাহেবের আত্মা তোমার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে।

রেখা তোমার ভগিনী। সকলের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শিক্ষা তুমি ও তোমার পিতা তাহাকে দাও নাই। তাহাকে তোমার পিতা উপদেশ ও তুমি উদাহরণ দিয়া শিখাইয়াছ লতার মত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পদদলিত হইয়া থাকা। শিক্ষা দিয়াছ কন্যার কর্ত্তব্য নিজের সুখ স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া অন্যায় দাবী মিটাইয়া যাওয়া। সেই কর্ত্তব্য করিতে গিয়াছিলে কাব্যপিপাসু, কোমল নারীর মন লইয়া,

যে মনের বিশেষত্ব প্রেমপাত্রের অনন্যচিত্ত অন্বেষণ। তাই অবশেষে যাহা তুমি করিয়াছিলে, রেণুকা দেবী, তাহা সবিশেষ জানিলে সমস্ত শিক্ষিত সমাজ শিহরিয়া উঠিবে। তোমার চিকিৎসক ও ভবিষ্যৎ আত্মীয়রূপে একমাত্র আমি তাহা জানিয়াছি। তুমি বিশ্বাস করিয়াছ আমি তোমার সর্ব্বপ্রকার আধিঃ ও ব্যাধি নির্ম্মূল করিতে পারিব।

* * * *

অদ্য পূর্ণিমা। পাহাড়ী প্রদেশের জ্যোৎস্না যেন মনে অহেতুক বন্যতা আনিয়া দেয়। যে-কথা, যে-চিন্তা অন্তরের কোণে অগোচরে থাকে তাহাকে টানিয়া বাহির করে।

আজ রেণুকার পিসীমার সহিত রায়সাহেবের বচসা হইয়া গিয়াছে একপালা। বিতর্ক রেণুর বিবাহ সম্পর্কীয়। রায়সাহেব ভগ্নির অনুযোগে বিরক্ত হইয়া চীৎকার করিয়াছিলেন,—"আমি মেয়ের বিয়ে দিলাম না? না, মেয়ের কপালে জুটলো না? টাকাকড়ি তো সবি ওর নামে আলাদা করে রেখেছি, বিয়ে না হলেও ভবিষ্যতে ওকে কখনই কষ্ট পেতে হবে না।"

সন্তানহীনা বিধবা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "টাকা নিয়ে মেয়েরা কখনো সুখে থাকেনা। একটু চেষ্টা না করলে হিন্দুঘরের মেয়ের কি আপনা থেকে বিয়ে হয়?"

"না হোক, আমি লোকের বাড়ী 'দয়া করো' দয়া করো' বলে সেধে পাত্র খুঁজতে যেতে পারবোনা এ বয়সে। একি তোমাদের যুগের গৌরী-দান যে খুঁজে ধরে আনতে হবে? হবার হলে পাত্র আপনি আসতো। ও না হয় বিয়ে না-ই করে থাকবে, ক্ষতি কি?"

"কারুর সঙ্গে কি তুমি ওকে মিশতে দাও দাদা, যে পাত্র আপনি আসবে? এসেও ছিল তো একবার।"

রায়সাহেব প্রচণ্ড চীৎকার করিয়া ধমক দিলেন,—"ওঃ, সেতো একটা লোফার। ওর হাতে মেয়ে দেবার চেয়ে মেয়েকে গলায় দড়ি বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেওয়া ভাল। এদিকে আমার এই অবস্থা, এখন তোমাদের হয়েছে বিয়ের সখ! দুদিন সবুর করো মরবার বেশী দেরী নেই আর।"

সুতরাং আর আলোচনা অগ্রসর হয় নাই।

আসিয়াছিল। তাহারো বত্রিশ বৎসরের জীবনে প্রেম না আসিলেও প্রার্থী একজন আসিয়াছিল। কিন্তু প্রবল পিতৃশাসনের ভয়ে রেণু তাহাব প্রতি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারে নাই। পিসীমার দূর সম্পর্কে শ্বশুরালয়ের আত্মীয়। দুই চারিবার অন্দরে যাতায়াত করিবার ফলে রেণুর বিশীর্ণ পুষ্পের মত ক্লান্ত মুখচ্ছবি তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সওদাগরী অফিসের কেরাণী সে, রায়সাহেবের গ্র্যাজুয়েট কন্যার উপযুক্ত তিনি তাহাকে বিবেচনা করেন নাই। সেই শেষ।

কেন অহেতুক বন্যতা? কেন দেহ ব্যাকুল? রেণু তো অসুস্থ পিতার সেবা ও সর্ব্বতোভাবে আজ্ঞাপালন ঐকমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া জানিয়াছে। মাতৃহীনা রেখার ভারও তাহারি উপরে। বর্ণবিহীন জীবন তাহার, নিস্তরঙ্গ দিনযাত্রা। তবু, আজ নিরালা রাত্রে, দক্ষিণা বাতাসে, মত্ত শাল-পুষ্প-সৌরভে মনে হয় পুরুষের চুম্বন কেমন!

সুকী আজ গান গাহিয়াছিল—"বাহা মা লাক্ লাক্।" ফুল তো লোকে লইতেই চাহিবে।

"Take away all the gifts that Death and Life may give" কিন্তু, বিশ্বব্যাপী পুষ্পচয়নউৎসবে সে-ই বা কেন বাদ যাইবে?

অস্পষ্ট চন্দ্রলোকে একটি পুরুষমূর্ত্তি দেখা গেল বৈদেশিক-বেশে, ট্রাউজার ও অর্দ্ধমলিন হাফশার্টে। রেণুদের গৃহসন্নিকটস্থ আমগাছের

নীচে দাঁড়াইয়া সেই মূর্ত্তি অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পরেই সুকী বাহির হইয়া আসিল এবং উভয়ের সামান্য কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে রেণুর সম্মুখ দিয়া সেই অচেনা পুরুষটি চলিয়া গেল। বিহ্বল চন্দ্রালোকে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত একবার মাত্র রেণুর ভীরু কটাক্ষ মিলিত হইল।

শক্তি যদি পৌরুষের পরিচয় হয়, অপরিমিত স্বাস্থ্যসম্ভার যদি সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি বলা যাইতে পারে যৌবনের, পুরুষত্বের, রূপের প্রকৃষ্ট বিকাশ সেইদিন বন্য পার্ব্বত্যদেশে রেণু দেখিয়াছিল। প্রস্তর-মূর্ত্তির নিখুঁত ভাস্কর্য্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার গঠিত, সবল প্রতি পদ-ক্ষেপে জীবনের অদম্য প্রকাশ লক্ষিত হইতেছে। ক্ষীণ কটির ঊর্দ্ধে প্রশস্তবক্ষ সহস্রনারীর চরম আশ্রয়স্থল। বঙ্কিম অধরে বাসনার নিষ্ঠুর মাদকতা। কিন্তু, গাত্রবর্ণ নিকষকৃষ্ণ।

সুকী রেণুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রবেশী যুবককে অশিক্ষিতা সাঁওতাল দাসীর সহিত কথা বলিতে দেখিয়া রেণু বিস্মিত হইয়াছিল। সুকীকে সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রলোকটি কে সুকী ?"

"ওইতো মাষ্টর।"

সাঁওতাল! অনার্য্য! কিন্তু—কী রূপবান!

আবার সহসা যেন কানের কাছে বাজিয়া উঠিল :—

"—While ye live
Take away all the gifts ...
Take away all the
Take away .."

* * * *

"ওই রূপ দেখে ভুলেছিলাম ইন্দ্র"—ক্লিষ্টস্বরে ক্ষীণালোকিত গৃহে

রেণুকা দেবী বলিয়া চলিলেন—"নিজের মুখে নিজের লজ্জার কথা বলি তোমাকে। তুমি ভুল বুঝোনা। এসব কথা আমার মনে বোঝার মত জমে আছে।"

জানি রেণুকা দেবী, বোঝা কোন না কোন স্থানে অপসারিত না করিলে চলার গতি ব্যাহত হয়। কিন্তু, যখন বোঝা বহুবার নামানো হইয়া গিয়াছে তখন বারে বারে এ প্রয়াস কেন? পুনরাবৃত্তি শুধু অপরাধ-স্খালনের জন্য নহে। বঞ্চিত চিত্তের প্রবৃত্তি নিবারণের এ এক উপায় তুমি বাহির করিয়াছ। তোমার যৌবন-অপরাধের আলোচনায় তোমার পয়তাল্লিশ বৎসরের জীবন প্রেমের ও কামনার ক্ষীণ আভাস খুঁজিয়া পায়। তাই রেণুকা দেবী, তোমার বয়োকনিষ্ঠ স্নেহপাত্র হইয়াও আমি তোমার এ মানস-বিলাসে প্রশ্রয় দেই। কারণ, আমি যে তোমার চিকিৎসক।

রেখার সযত্ননির্ম্মিত চায়ের পাত্র মুখে ধরিয়া ছায়াসঙ্কুল অন্ধ-আলোকিত রোগগৃহে বসিয়া চিরকুমারীর বিকৃত প্রলাপ আমার শুনিয়া যাইতে হইতেছে—যখন বাহিরে পৃথিবী অপরূপ শোভা ধরিয়া পথ চাহিয়া আছে, আর তাহারই সহিত পথ চাহিয়া আছে রেখা। কিন্তু শুনিয়াছি প্রেমের জন্য ইহা অপেক্ষাও অনেক কঠিন ত্যাগ অনেক পুরুষ করিয়াছে। সুতরাং তুমি বলিয়া যাও, আমি শুনি। তুমি বলিয়া যাও অখ্যাত প্রদেশের এক অনার্য্যের হতাশ প্রেমকাহিনী, মানসিক বিতৃষ্ণার নিকট দৈহিক আকর্ষণের চরম পরাজয়। তুমি বলিয়া যাও সেই অনার্য্যের দেহসৌষ্ঠব, তাহার আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ—শিক্ষা ও সংস্কারের কঠিন পরিমণ্ডলকে যাহা মোমের মত দ্রবতায় গলিত করিয়াছিল।

* * * *

বেণুর হাতে সুকী একখানা খামে মোড়া চিঠি আনিয়া দিয়া হাসিয়া পলায়ন করিল। বসিবার ঘরে বেতের চেয়ারে হাতের বোনাটা রাখিয়া বেণুকা পত্রখানি খুলিয়া প্রেরকের নাম দেখিতে গেল। তাহাকে পত্র লিখিবার কেহ এখানে নাই।

অভাবনীয় পত্র পাঠ করিয়া বেণু কম্পিতহস্তে সীবনকার্য্যের বেতের বাক্সটির মধ্যে চিঠিখানা লুকাইয়া রাখিয়া অত্যন্ত মনোযোগের ভানে বোনাটা আবার তুলিয়া লইল। বাহিরে কাহার যেন পদশব্দ শ্রুত হইতেছিল। যদি তাহার পিতা কোনক্রমে এ পত্রের অস্তিত্ব জানিতে পারেন তাহা হইলে চিরদিনের মত তিনি বেণুরই উপরে দোষারোপ করিবেন নিঃসন্দেহে। অর্দ্ধশিক্ষিত সাঁওতাল যুবক ভদ্রঘরের শিক্ষিতা, বয়স্থা কুমারীর নিকটে কিসের প্রশ্রয়ে প্রেমপত্র পাঠাইবার সাহস পায় কোথা হইতে?

নিদারুণ লজ্জায় বেণুর কুঞ্চিত অলকাবৃত বিবর্ণ ললাট অরুণরঞ্জিত হইল। এই তাহার জীবনে প্রথম প্রেমপত্র! কিন্তু পাত্র অশিক্ষিত, হীন সাঁওতাল। বিতৃষ্ণায় বেণুর অন্তর আকুঞ্চিত হইতে লাগিল। কি স্পর্দ্ধা তাহার? বেণুকে সে দূর হইতে দেখিয়া ভালবাসিয়াছে। তাহার রচিত গান বেণু শুনিয়াছে তাহাতে সে ধন্য। তাহার আরো গান আছে। বেণু যদি তাহাকে অনুমতি দেয় তাহা হইলে সে বেণুর সহিত দেখা করিয়া তাহাকে গান শুনাইতে চায়।

পরিষ্কার হস্তাক্ষর, বর্ণাশুদ্ধি নাই। সাঁওতাল এত ভাল বাংলা জানিল কোথা হইতে? মনে পড়িয়া গেল সুকী যে পরিচয় দিয়াছিল...মিশন স্কুলের শিক্ষক—প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ···ক্রিশ্চান ধর্ম্মাবলম্বী কবি।

বেণুকে সে ভালবাসিয়াছে। এই রক্তধূলি-মণ্ডিত শালাকীর্ণ

বন্য প্রদেশে, গুলঞ্চ বৃক্ষের ছায়ায়, পাহাড়ী ঝর্ণার পার্শ্বে শুষ্ক বিগত-যৌবনা চিরকুমারীর জন্য এই প্রেম সঞ্চিত ছিল! অলক্ষিতে মধু সংগ্রহ হইয়াছে—ভ্রমরা, তুমি এসো!

ভ্রমরা, তুমি এসো। জীবন অপেক্ষাও চঞ্চল যৌবন। শেষ হইয়াছে, কিন্তু এখনো ক্ষীণ রেশ তাহার তোমাকে বসন্ত রজনীতে, বর্ষাদিনে ব্যাকুল করিয়া তোলে। এখনো সামান্য সময় আছে, তাহার পর আর থাকিবে না।

"We have short time to stay,—
We have as short a spring—"

কানের কাছে বিদেশী কবির করুণ বিলাপ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সে সাঁওতাল, তাহাতে ক্ষতি কি? তাহার বর্ণ নিকষকৃষ্ণ, তোমার মলিনগৌর, তাহাতে প্রভেদ হয় না। যৌবন যৌবনকে ডাকিলে আর্য্য-রক্তও অনার্য্য আহ্বানে সমান উদ্বেল হইয়া ওঠে। যদি দেহের বন্দনা করিতে চাও—চশমালাঞ্ছিত নয়ন ও সূক্ষ্ম বসনাবৃত ক্ষীণদেহ অপেক্ষা অশিক্ষিত হীণজাতীর সবল দেহগরিমা কি অধিক ঈপ্সিত নহে?

* * * *

"ইন্দ্র, ভাল করে ব্যাপারটা ভেবে দেখ। আমার তখন যথেষ্ট বেশী বয়েস হয়ে গেছে! সম্মুখেও অন্ধকার ভবিষ্যৎ। একটা মরিয়াভাব এসে গেল। অত সুন্দর ছিল সে দেখতে! বাবাকে তো ভয়েই কিছু বলতে পার্‌লাম না। বাবা তখন একটু সুস্থ ছিলেন। ওখানে সাহিত্যসভার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, প্রায় বাড়ী থাক্‌তেন না! ঝরণার ধারে আমি বিকেলবেলা বেড়াতে যেতাম। ওইখানেই দেখা হোত।—

—ইন্দ্র, তুমি বোধহয় আমাকে ঘৃণা করছো। গোড়ায় আমি গিয়েছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে। সাঁওতাল সে আমাকে চিঠি পাঠাতে সাহস করেছিল, তাই মনে কৌতুহল হোল। ভাবলাম একবার চোখে দেখে নিষেধ করে আসবো। কিন্তু হাতে করে অনেক কবিতা এনেছিল, পড়ে শোনাতে চাইল। না বলতে পারলাম না। জানতো আমি কি রকম কবিতা ভালবাসি।" জানি। জানি তুমি কবিতা ভালবাস, সেই কবিতা ছন্দে-সুরে গাঁথিয়া তোমার অনার্য্য-প্রেমিক তোমাকে শুনাইত। অন্যের উদ্দেশে রচিত তৃতীয় ব্যক্তির যে-সব কাব্য-সংগ্রহ পাঠ করিয়া তুমি লুব্ধ হইতে, সেইরূপ কাব্য তোমাকে উদ্দেশ করিয়া সে রচনা করিয়াছিল। কবিতার মধ্য দিয়া প্রেমনিবেদনকে প্রত্যাখান করিতে পার নাই। হীনবর্ণ পুরুষের প্রেমপ্রকাশে তোমার শিক্ষাসংস্কারযুক্ত যে চিত্তের একপার্শ বিতৃষ্ণায় বিমুখী হইয়া উঠিত, সেই চিত্তেরি অন্যপার্শ্ব সুরের আহ্বানে অহরহ স্পন্দিত হইত। অসভ্যজাতির সহিত সভ্যজাতির যোগসূত্র আদিম যুগ হইতে আজিও এক।

"ইন্দ্র, নিজের অজ্ঞাতে বহুদূর এগিয়ে গেলাম। কল্‌কাতায় স্বপ্নেও যা ভাবতে পারিনি ওখানে তাই হোল। এখনও ভাবতে আমার আশ্চর্য্য লাগে কি করে অত নীচে আমি নাম্‌তে পেরেছিলাম! কী শাসনের মধ্যে অতি ভদ্রভাবে বাবা আমাকে মানুষ করেছিলেন। তা তো বলেছি।"

রেণুকা দেবী, অতি-ভদ্রতা ও অতি-শাসনে তোমার সকল সত্তা শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রেমবিহীন যৌবনের প্রান্তে উপনীত হইলে যে হতাশা, যে বন্ধনহীন দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় তাহাই তোমাকে সমাজ-সংস্কারের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া অনার্য্যের বাহুপাশে আনিয়াছিল। অতি-মুক্ত লতার মত

কোমল ছিল তোমার আশ্রয়প্রার্থী নারীচরিত্র। প্রতিরোধের ক্ষমতা তুমি হারাইয়া ফেলিয়াছিলে।

"ইন্দ্র, তুমি তো সমস্ত বোঝো। কী রকম যেন হয়ে গেলাম। ধরা পড়বার ভয়, ঘৃণা এ সমস্ত যেন আমাকে আরো ওইদিকে ঠেলে দিত। ব্যবহার, কথাবার্ত্তা কিছুই তার সাঁওতালের মত নয়। আর দেখতে বড় সুন্দর ছিল। যতক্ষণ সামনে থাকতো ততক্ষণ কোন দ্বিধাই আসতো না। পরে মনে ভেবে দেখলে একটা বিতৃষ্ণা হোত, কিন্তু আবার কাছে আস্‌লেই সেটা মিলিয়ে যেত। ইন্দ্র, কি বল্‌বো? তুমি বুঝে নিও।"

আমি বুঝিয়াছি। আরো বুঝিয়াছি আজ এ লজ্জার মধ্যে তোমার কতখানি গৌরব আছে। একদিন যৌবনের আহ্বানে, প্রেমের আহ্বানে তুমি অসঙ্কোচে দ্বিধা-ভীরুতা পদদলিত করিয়া সাড়া দিয়াছিলে। তোমার এই বাতব্যাধিপীড়িত, গলিত, শিথিল দেহের প্রতিটি অংশ একদিন একজন ভালবাসিয়াছিল। হে আজন্মকুমারী প্রৌঢ়া, আজ সে-স্মরণ তোমাকে পুলক দিতেছে। রেণুকা দেবী, তোমার কলঙ্ক সেদিন ছিল না, তোমার কলঙ্ক আজ এইখানে।

* * *

দুইদিন হইল রায়সাহেব অসুস্থ হইয়া বিরক্তচিত্তে দিবা অতিবাহন করিতেছেন। সাহিত্য-সভার উদ্যোগপর্ব্বে তাঁহার সর্দ্দারী ক্ষান্ত পড়ার ক্রোধ তিনি অনেকটা কন্যার উপর দিয়া ঝাড়িতেছেন।

দুইদিন রেণু ঝরণার ধারে যায় নাই। অবশ্য ইচ্ছাও তাহার ছিল না, পিতার অসুস্থতা একটি অজুহাত মাত্র। কিছুদিন পূর্ব্বে আকর্ষণ-বিকর্ষণের মন্থনে যে বিষ উঠিয়াছে, তাহার ক্রিয়ায় রেণু

অবসন্ন। আজ মুক্তি তাহার একমাত্র কাম্য। মোহের শেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, অজানার ইঙ্গিত আর কিছু নাই!

প্রতিটি দিন তোমাকে যে লক্ষ্যে অগ্রসর করাইতেছিল, যে লক্ষ্যে উপনীত হইবার অন্ধ-বাসনা তোমাকে অহরহ শান্তিহীন করিয়া তুলিল সেই লক্ষ্যস্থলে আসিয়া আজ তোমার সমস্ত বাসনা ও প্রেমের মৃত্যু হইল! প্রেমে যে চরমতার প্রত্যাশা নিজের অজ্ঞাতসারেও শৈশব হইতে করিয়া আসিতেছিলে তাহার প্রাপ্তিতে এত বিতৃষ্ণা কেন? নারী, তুমি আজো জান না তুমি কি চাও।

আজ যাইতে হইবে। সে হয়তো অসহিষ্ণু হইয়া একটা অসঙ্গত কিছু করিতে পারে। তাহাকে অসহিষ্ণু হইতে দিবার সাহস রেণুর আজ নাই। রেণুর মানসম্ভ্রম সমস্ত তাহার প্রণয়ীর নীরবতার উপর নির্ভর করিতেছে।

"আসতে পারোনি, তাতে কি হয়েছে? বাবার অসুখ, আমি না হয় দেখতে যাব।" মুখের সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া সাঁওতাল যুবক রেণুর হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিল। তাহার সমস্ত মুখে দ্বিধাহীন সারল্য, যাহা একমাত্র অনার্য্য জাতিতেই সম্ভব। স্বপ্নময় চক্ষু দুইটিতে তাহার একান্ত নির্ভরশীল প্রেম।

স্পর্শের সহিত রেণুর দেহ বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। কোনমতে অনিচ্ছার ভাব দমন করিয়া রেণু সবেগে প্রতিবাদ করিল, "সর্ব্বনাশ! বাবার সঙ্গে দেখা করতে কখনো যেও না"

সে হাসিল, অতি সুগঠিত শুভ্রদন্ত অস্তসূর্য্যের আলোতে হীরক দীপ্তিতে ঝলকিয়া গেল,—"রাগ করবেন তো? তাতে কি হয়েছে? একদিন তো বল্‌তেই হবে।"

রেণু নীরব হইয়া রহিল। সে আশা করিয়াছে রেণু তাহাকে বিবাহ করিবে। যাহাকে অকাতরে নিজের দেহ ও প্রেম দান করা চলে, তাহাকেই যে পাণিদান করা যায় না, অসভ্য যুবক তাহা জানে না। ড্রইংরুম-বিলাসী যে কোন সভ্য পুরুষকে যে-কথা রেণু অসঙ্কোচে বলিতে পারিত, আজ সেই কথা কবিতার-ভাষায় তাহার মনে আসিলেও মুখে আসিল না—

"Thou lovest; but ne'er knew love's sad satiety."

আবার পূর্ণিমা ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রশস্ত বারান্দায় বেতের আরাম-কেদারায় রায়সাহেব বসিয়া আছেন, তাঁহার পায়ের কাছে রেণু পদসেবা করিতেছে। রেখা ও পিসীমাও উপস্থিত। আর কয়েক দিন পরেই তাঁহারা কলিকাতা ফিরিয়া যাইবেন। সাহিত্য-সভা শেষ হইয়াছে, রায়সাহেবের প্রবাস-যাপনের উৎসাহও শেষ হইয়াছে।

যত ব্যস্ততা প্রয়োজন তাহার দ্বিগুণ ব্যস্ততায় এই বিগত সপ্তাহ ধরিয়া রেণু সংসার গুটাইয়া বাঁধিয়াছে। এস্থান হইতে পলায়ন করিতে পারিলে সে মুক্তি পায়। অশুচি স্পর্শের ছায় অবাঞ্ছিত স্মৃতি তাহাকে চিরদিন গ্লানি দিবে সত্য; কিন্তু তাহা স্মৃতি মাত্র হইয়া থাকিবে ভীতিপ্রদ বাস্তবের রূপ ধরিয়া অনির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষায় তাহার বিমুখী দেহ-মনের নিকটে করপ্রসারণ করিবে না। রেণু অবশ্য এ কয়েকদিন ঝর্ণার ধারে যাইবার অবকাশ পায় নাই। কল্য দেখা যাইবে।

কিন্তু, আজো উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে পুরুষমূর্ত্তি দেখা গেল, দূর হইতে আসিয়া রেণুদের বাড়ীর হাতায় সে প্রবেশ করিল। আজো পূর্ণ চন্দ্রালোকে গ্রীক-ভাস্কর্য্যের আদর্শ দেহ, তীক্ষ্ণ নয়ন, কোমল অধরোষ্ঠ

পৌরুষ সৌন্দর্য্যে প্রতীয়মান হইল। যৌবনের ডাক, প্রেমের ডাক পূর্ণচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া অনার্য্য-প্রেমিকের অশান্ত রক্তধারাকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া গৃহছাড়া করিয়াছে। এক সপ্তাহের অদর্শনে সে ব্যাকুল হইয়া তাহার প্রিয়ার কাছে আসিয়াছে, সরল বিশ্বাসে তাহাকে দাবী করিতে।

রায়সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রোষনেত্রে চাহিলেন। অনাত্মীয় যুবক অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার পারিবারিক সম্মেলনে যেন যোগদান করিতে আসিতেছে।—"কে? কাকে চাও তুমি?"

সে হাসিল...সেই মনোহর আশ্চর্য্য হাসি, যাহা রেণুকে উন্মাদ করিয়া তাহার অত নিকটে টানিয়া লইয়াছিল। তাহার সাদর অভ্যর্থনায় যেন কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা এমনিভাবে সে বলিল, "আমি রেণুর কাছে এসেছি।"

"কী?"—তীরবেগে বাতব্যাধি ভুলিয়া রায়সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—"রেণু!"

রেণুর ভীতিস্তম্ভিত, ব্যাকুল দৃষ্টি একবার তাহার দিকে মিনতির আবেদনে ছুটিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে পিতার উগ্র মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রেণু স্পষ্ট উত্তর দিল, "ওকে আমি চিনি না।"

* * *

"তারপর?"—রেণুকা দেবীর আরো একটু নিকটে সরিয়া আসিলাম। না চাহিয়াও বুঝিলাম নয়নপল্লবে তাঁহার অশ্রুর আবির্ভাব।

"তারপর ইন্দ্র, আর বোলোনা। দু'একবার সে বলতে চেয়েছিল আমার সঙ্গে তার আলাপ আছে। কিন্তু বাবা তখন ক্ষেপে গেছেন। আমাদের দারোয়ান আর দুজন চাকর তাকে বাবার

হুকুমে ধরে বেঁধে ফেল্লো। তারপর আমাদের সরিয়ে দিয়ে তার শাস্তির ব্যবস্থা হোল। সুকী ব্যাপার দেখেই পালিয়ে গিয়েছিল। অত মার দেবার পরেও বাবা তৃপ্ত হলেন না। পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর বাবার বন্ধু, তাঁকে চিঠি লিখে ট্রেস্‌পাসের অজুহাতে থানায় চালান দিলেন। ছ'মাসের জেল হোলো।'

একবার শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কিছু বল্লেন না?" মৃত পিতাকে স্মরণ করিয়া আজিও রেণুকা দেবী শিহরিয়া উঠিলেন,— "সর্ব্বনাশ! বাবা তাহ'লে আমাকে মেরেই ফেলতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ও-ও কিন্তু আর কিছু বল্লোনা। সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করলো।"

চিন্তা করিয়া বলিলাম, "বোঝা যাচ্ছে সাঁওতাল হলেও সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করে ওর সহজ-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ হয়েছিল। যেখানে প্রতিবাদ করে লাভ নেই, বরঞ্চ লোকসান, সেখানে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের রীতি।"

রেণুকা দেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শায়িত হইলেন,—"আমার মনে হয় আমার নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে ঘৃণায় সে চুপ করে ছিল। ইন্দ্র, মহাপাপ করেছি। এর প্রায়শ্চিত্ত কবে শেষ হবে?"

প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। যুগ যুগ ধরিয়া এমনি ঘটিতেছে। পবিত্র আর্য্যশোণিতের জয়যাত্রায় বহু অনার্য্য রক্তধারা নীরবে বহিয়া গিয়াছে। বহু নারীর পদ-প্রসাধনের নিমিত্ত বহু পুরুষের হৃদয়রক্ত উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এসব কথা ভুলিয়া থাকাই মঙ্গল সুতরাং, হে রেণুকা দেবী, তুমিও ভুলিয়া যাও।

সন্ধানী

'প্রোসারপিনা, অনির্ব্বাণ দীপ কেবল তোমার ধরিত্রী মাতা সেরিসের হস্তেই জ্বলে নাই। রসাতলের রাজা প্লুটোর অপহৃতা সুন্দরি, অনির্ব্বাণ মশাল জ্বালাইয়া তোমার মাতা তোমার সন্ধানে ফিরিয়াছিলেন। সে সন্ধানের শেষ হইল ধরিত্রীর বসন্তে। কিন্তু হায় প্রোসারপিনা, আমার সন্ধানের শেষ নাই। সেরিসের হাতের অনির্ব্বাণ শিখা আমারও অন্তরে জ্বলিতেছে চিরকাল।'

রজত আমার দিকে চাহিয়া ছিল না কোনদিনই সে থাকে না। তবু তাহার চুরোটিকা-চুম্বনকারী নির্ব্বাক অধরোষ্ঠ হইতে ওই কথাগুলি যেন আমার দিকে ভাসিয়া আসিল। সিগারেটের নীল ধূম্রজাল ভেদ করিয়া ঈষৎ কপিশ নেত্রতারকায় তাহার জ্বলিয়া উঠিল সেই সন্ধানের আলো, যে আলোকে আমি ভয় করিতে শিখিয়াছি।

"শোন কাঞ্চন, কয়েকদিন একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসতে চাই। আমার হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে তুমি নোট টোক—এখানে পড়ে পড়ে।"

হায় রজত! চিরকালই আমি পড়িয়া থাকি, আজও থাকিব। কিন্তু, তুমি কোনদিন আমার নীরব প্রতীক্ষার কথা আভাসেও জানিতে পারিলে না! কতদিন তোমার নিকটে গিয়াছি মনে অসম্ভব সাহস লইয়া। ভাবিয়াছি আজ আমি অবশ্যই নিজের অন্তর উন্মোচন করিব। আজ আমি চিত্রাঙ্গদার মত আমার পার্থের প্রেমভিক্ষা করিব। চোখে চোখ মিলিয়াছে। সহসা যেন মনে হইয়াছে

তুমি আমার বড আপন, তোমাব কাছে লজ্জা আমাব নাই। এই মুখ খুলিলাম। একটি নিমেষ মাত্র। সহসা তোমাব চোখ যেন আমার প্রতি চাহিয়াও আমাকে দেখিল না। যেন আমার গণ্ডী হইতে তোমার দৃষ্টি বহুদূরে প্রসারিত হইয়া গেল—মিশরের নদীতটে, আরবের বালুকায়। তোমার চক্ষে প্রদীপ্ত আলোক জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে ছিন্ন কাগজের মত আমি ভস্মসাৎ হইয়া গেলাম।

রজত, তুমি সন্ধানী। কখনও তুমি ভালবাসার সন্ধান কর, কখনও সাফল্যের। কখনও মনে কর একটি চমৎকার কর্ম্মজীবনই তোমাকে আনন্দ দিতে পারিবে। তুমি জাননা তুমি কি চাও। খুব কম মানুষই জানে তাহারা কি চায়। যদি জানিত তাহা হইলে সে বস্তুর সন্ধান করিয়া তাহারা নিজের সুখের ব্যবস্থা নিজে করিয়া লইত। প্রকৃত জ্ঞান তাহারা লাভ করিত, জ্ঞানের ফল-স্বরূপ সুখ দূরে থাকিত না।

আমি জ্ঞানী নই, তবু আমি জানি আমি কি চাই। আমি চাই তোমাকে। তোমার হাতেই আমার সুখের সন্ধান আছে।

কলিকাতার অখ্যাত গলিতে পাশাপাশি দুইখানি ছোট বাড়ী, এক আকারের, এক রংয়ের, এক দরের বাড়ী। এক সঙ্গে তোমার এবং আমার বাবা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন! তাঁহারা বন্ধু। সেই বাড়ীতে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম তুমি ও আমি সামান্য কয়েকমাসের ব্যবধানে। আশ্চর্য্য নয় কি? নাম রাখা হইয়াছিল মিল রাখিয়া, রজত ও কাঞ্চন।

কিন্তু মিলের শেষ ওখানেই। আকারে প্রকারে এত বৈলক্ষণ কেহ দেখে নাই। একসঙ্গে খেলা করিয়াছি, পড়াশোনা করিয়াছি।

কিন্তু, এক হইতে পারি নাই। তোমার নামের মর্য্যাদা রাখিয়া তুমি কি হইয়াছ? দাঁড়াও, তোমার ছবি দেখি। চুপে চুপে তোমার ছবি আঁকিয়াছি, গোপনে তাহা ডেস্কে লুকাইয়া রাখিয়াছি। রাত্রির জনহীন প্রহরে অনিমেষ নেত্রে তাহা দেখি। প্রতিদিন তোমার সহিত দেখা হয়। কিন্তু, চঞ্চল তুমি, তোমাকে ধরিতে পারি না। তাই রংয়ের বন্ধনে তোমাকে ধরিয়া রাখিয়াছি। ওই চিত্রে অঙ্কিত তুমি একান্তই আমার। তোমাকে দেখিলে মনে হয় ঠাকুরমায়ের মুখে শোনা স্তোত্র—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্ন-কল্পোজ্জলাঙ্গম্—"

রজত-গিরি তোমার উপমা, রজত। আমি? দাঁড়াও আমারও ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছি আয়না সম্মুখে ধরিয়া। বিশেষত্ববিহীনা, সাধারণ শ্যামাঙ্গী। চক্ষে আমার রত্ন জলেনা, অধরের হাস্যে গোলাপ ঈর্ষায় পাণ্ডু হয় না। তবু পাশাপাশি দুইখানি চিত্র রাখিয়া চুরি করিয়া দেখিবার লোভ আমার প্রচুর।

একত্রে আমরা মানুষ হইলাম। কিন্তু, রজতকে ছোট দ্বিতল বাড়ী, গলির রাস্তা বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। বৃহৎ জীবনের মহত্ত্ব তাহাকে বহু দূরে, আমার নিকট হইতে দূরে টানিয়া লইতে লাগিল। আমি বড় হইলাম। স্কুল-কলেজে নিয়মিত যাইতাম, বাড়ীতে ঘরের কাজ করিয়া অবকাশ সময়ে ছবি আঁকিয়া সময় কাটাইতাম। রজত চাহিত অন্য কিছু, যাহা তাহার গণ্ডীর বাহিরে, যাহা তাহার দুইখানি শয়নের এবং একখানি বসিবার ঘরওয়ালা ঈষৎ হলুদ রংএর বাড়ী, খোয়া-ওঠা প্রাচীন গলিপথের কোথাও নাই। কেমন অস্থির ভাবে সে কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইত, কখনও

উন্মন. হইয়া বিবর্ণ ধূম্র-মলিন আকাশের ফালির দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহার তাহাই ছিল অসামান্যতা। ভাগ্য তাহাকে যেমন বঞ্চনা করিয়াছে, তেমনি ভাগ্যের নিষ্ফল করিবার চক্রান্তে ধরা দিয়া সুশীলা—সাধ্বী—শ্যামাঙ্গীর স্বামী হইয়া, রুগ্ন-সাধারণ পুত্রকন্যার জনক হইয়া দিনযাত্রার একঘেয়েমিকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য রজত জন্মগ্রহণ করে নাই। জীবনকে সে নিজের মূল্যে গ্রহণ করিবে ইহাই ছিল তাহার পণ। শিল্পী চরিত্রের অনুসন্ধিৎসা তাহার চরিত্রে প্রবল দেখিতাম। তাই আমার শিল্পী-হৃদয় স্বজাতি জ্ঞানে তাহাকে ভালবাসিত। আমার আত্মা সন্ধান করিত না? তাহার চাওয়ার বস্তু তাহার সম্মুখেই ছিল, সে বস্তু রজত। রজতের বিচিত্র মনের অনুসরণই আমার সন্ধানের রূপ।

আই-এ পাশ করিলাম রজতের একবছর পরে। রজত তখন বি-এ পড়ে। বি-এ পড়িতে পড়িতে রজতের খেয়াল হইলে সে-শিল্পী-জীবন গ্রহণ করিবে। সুতরাং পড়াশোনা ছাড়িয়া সে আর্ট-স্কুলে ভর্তি হইল। তাহার পিতা ধনী না হইলেও একমাত্র সন্তান হিসাবে রজতের সমস্ত খেয়াল প্রশ্রয় পাইত।

আমি চিরদিন চিত্রকলার অনুরাগী। আমার অঙ্কিত ছবির উপর মুরুব্বিয়ানা করিয়া রজত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল। আমার সহিত পাল্লা দিয়া জলে রং গুলিয়া রজত কাগজ চিত্রিত করিয়াছে। তাই বি-এ পড়িতে পড়িতে অশান্ত চিত্ত তাহার অন্য কিছু নির্গম-পথ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। সন্ধানী চিত্ত শেকস্‌পীয়রের নাটক এবং পলগ্রেভের কাব্য-সঞ্চয়নে ডুবিয়া রহিল না।

সেদিন, রজতকে বলিয়াছিলাম, "বি-এ পড়াটা ছাড়লে কেন, রজত? বড় অস্থির তুমি।"

রজত আমার ঘরটির মধ্যে ইতস্তত পদচারণা করিতেছিল, মুখে তাহার জ্বলন্ত সিগারেট। চুল রুক্ষ। অতি প্রশস্ত তুষার-গৌর ললাটে চিন্তিত অন্যমনস্কতার ছায়া। বায়রণের মত প্রেমিক অধর তাহার।

রজত একবার আমার দিকে চাহিল, তারপরে বামহস্তে ললাটের কেশ অপসারিত করিয়া ছাদের কড়িবরগার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অতি মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কাঞ্চন, প্রোসারপিনার গল্প জান?"

আমার স্বীকারোক্তি শুনিয়া রজত বলিল, "সেরিসের হাতের মশালের কথা মনে আছে, কাঞ্চন? সেই সন্ধানের মশাল আমার মনে সব সময় জ্বলে। কি চাই বুঝিনা, খুঁজে বেড়াই।" মৃদুকণ্ঠ রজতের আরও মৃদু হইয়া অস্ফুট আবৃত্তিতে নিবৃত্ত হইল—

"—The soul is fainting
Till she search and learn her own."

অধোমুখে কাঠের মত বসিয়া রহিলাম। চক্ষে অভিমানে জল আসিল। আমি যে-সন্ধানের মধ্যে নাই, সে-সন্ধান আমার পক্ষে অসহ্য পীড়াদায়ক। তবু আমার সুখ ওই নিষ্ঠুর সন্ধানীর হাতে। সুতরাং আমিও তাহার সহিত আর্টস্কুলে ভর্ত্তি হইব। সে সাধারণী পাঠ গ্রহণ করিতেছিল, তাই তাহারি জন্য আমিও আমার প্রকৃত শিল্পীচরিত্রের তাগিদ অমান্য করিয়া আই-এ পড়িতে গিয়াছিলাম। এখন তাহারি জন্য আমিও তাহার পথ,—আমার নিজের পথ,—ধরিলাম।

সেইদিন হইতে বুঝিলাম রজতকে আমি কত ভালবাসি, আর বুঝিলাম আমার প্রতি তাহার প্রেমের একান্ত অভাবকে। সেইদিন হইতে রজতের চক্ষে সন্ধানী আলোর নিশান ওড়া দেখিতে শিখিলাম।

অহরহ যেন রজতের মনের অকথিত বাণী শুনিতে লাগিলাম,—'হায় প্রেসারপিনা, আমার সন্ধানের শেষ নাই।'

রজত শিল্পী হইল। দেখিতাম কড়া চায়ের পাত্র এবং অসংখ্য সিগারেট মুখে ধরিয়া রজতের রাত্রিদিন ছবি আঁকা। স্কুলে যতক্ষণ থাকিত ততক্ষণ চলিত। বাড়ী ফিরিয়াও সে তন্ময়তার বিরাম ছিলনা। একখানি ঘরকে রজত তাহার চিত্রশালাতে পরিণত করিল। একপার্শ্বে পাথরের ত্রিপদীর উপরে তাহার জননী আহার্য রাখিয়া যাইতেন। যখন সময় হইত তখন সে আহার করিত।

সেদিন ছিল রজতের জন্মদিন। সকাল বেলা তাহার প্রিয় খাদ্য বাঁধাকপির পায়েস ও রাধাবল্লভী নিজহাতে তৈরী করিয়া মুখ-ঢাকা পাত্রে দিতে গেলাম। দেখিলাম চিত্রশালায় রজত এধার-ওধার খাঁচার সিংহের মত অসহিষ্ণু ব্যস্ততায় পায়চারি করিতেছে। চলাফেরায় তাহার উল্লাস-মত্ততা।

"হেলো কাঞ্চন, ও-কি ? দাও খাই। জান কাঞ্চন, আজ কি হবে ? মৃগাঙ্ক দত্ত আসবেন আমার ছবি দেখতে আমার এই বাড়ীতে। মিসেস্ ভাটিয়া ঠিক করে দিয়েছেন।" মিসেস্ ভাটিয়া রজতের প্রেমমুগ্ধা বান্ধবী, প্রৌঢ় স্বামীর তরুণী স্ত্রী।

মৃগাঙ্কমোহন দত্ত খ্যাতনামা শিল্পী ও চিত্রসমালোচক। তাঁহার মতামত শিল্প-জগতে অতি মূল্যবান। আমাদের নিকট তিনি দেবতা বিশেষ। সুতরাং পুলকিত হইলাম।

রজত সহজ আত্মপ্রত্যয়ের সহিত বলিয়া চলিল, "কি ভাবে ছবিগুলো সাজালে ভাল হবে বলতো, কাঞ্চন। আজ ওঁর মত শুনে কাল নিশ্চয় বাবাকে যেয়ে বলবো, আমি প্যারিসে যাচ্ছি ছবি আঁকা শিখতে।

আমি মৃগাঙ্ক বাবুর সার্টিফিকেট্ পেলে বাবা নিশ্চয়ই বুঝবেন যে আমি চেষ্টা করলে বড় শিল্পী হ'তে পারি। এ দেশ আর ভাল লাগেনা। অন্য কোথাও দূরে চলে যেতে চাই। বেশ হয়েছে খাবার, কাঞ্চন। কিন্তু এত কেন? একটা বাখাবল্লভী খাও তুমি।" বন্ধুর সহজ আগ্রহে রজত আমার মুখে খাবার তুলিয়া দিল।

হৃদয়াবেগ দমন করিয়া বলিলাম, "দেশে থেকে কি বড় হওয়া যায়না, রজত?"

"না। আমি পালিয়ে বাঁচতে চাই।"

চিত্রাদি সজ্জিত করিতে করিতে রজত সহসা আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমিও তো ছবি আঁক, কাঞ্চন। তোমার ছবি ক'খানা নিয়ে এস।"

'তুমিও তো ছবি আঁক কাঞ্চন!' কষ্ট করিয়া রজতের মনে করিতে হয় আমি কি। বলিলাম, 'আমার ছবি তোমার পাশে! থাক রজত। আমার অনিচ্ছাতে তাহার জিদ বাড়িয়া গেল। বাধ্য হইয়া তিনখানি ছবি আনিয়া একপাশে রাখিলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে মৃগাঙ্কমোহন দত্ত দেখা দিলেন। অতি রাশভারী বুলডগের মত মূর্ত্তি। কথাবার্ত্তা কম বলেন। মিসেস ভাটিয়ার সুন্দর মুখের অনুরোধে একটি অপরাহ্ণ নষ্ট করিতে হইবে এইভাব তাঁহার নির্লিপ্ত আত্মসমর্পণে। গিলে-করা দেশী ধুতির প্রান্ত এবং আদ্দির পাঞ্জাবীর আস্তিনের সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া ক্ষণেক্ষণে ললাটদেশ তাঁহার তরঙ্গিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ঘরটির প্রত্যেকখানি ছবি তিনি নীরবে মনোযোগ দিয়া দেখিলেন। তারপরে দরজার পাশে চেয়ারে বসিয়া রজতের সুশীতল আতিথ্য বরফ-শীতল লিমোনেড, আইসক্রীম সন্দেশ ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। একটি দুইটি অতি প্রয়োজনীয় কথা ভিন্ন তখনও তিনি নীরব।

আমার হাত ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে লাগিল। রজত আশা করিয়াছিল মৃগাঙ্ক দত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবেন। ব্যতিক্রম দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেও সে নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিল। তাই অভ্যস্ত প্রফুল্ল সহৃদয়তার সহিত সে একাই কথাবার্তা চালাইতে লাগিল।

ভৃত্য ভুক্তাবশেষ অপসারিত করিলে মৃগাঙ্কমোহন মোটা চুরোট ধরাইলেন। রজতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তারপর, এ লাইনে তুমি এলে কেন?"

রজতের চক্ষে পরিচিত সন্ধানের আলোক জ্বলিয়া উঠিল, ব্যগ্র ভাবে সে বলিতে লাগিল, "ভেতর থেকে একটা তাগিদ এসেছিল আমার। কি যেন খুঁজে বেড়াতাম! ছবি আঁকার মধ্যে মন অনেকটা মুক্তি পেয়েছে। একটা আলো যেন—"

বাধা দিয়া মৃগাঙ্কমোহন অকস্মাৎ মুখর হইয়া উঠিলেন, —"পথ দেখিয়েছে তো? ওসব কথা জানি আমি। কিন্তু, সে আলো তোমাকে ভুল পথ দেখিয়েছে, রজত রায়। জীবনে মাত্র একখানিও ভাল ছবি তুমি এঁকে উঠতে পারবেনা। তোমার চোখ নেই, মন নেই। প্রত্যেকটি ড্রয়িং তোমার ভুল হয়েছে, প্রত্যেকখানার রং স্বাভাবিকের বাইরে গেছে। কিন্তু অতীন্দ্রিয়ের রং-ও তুমি ধরতে পারনি। রজত রায়, তোমার ছবি ভালগার।" বিরক্ত উত্তেজনায় মৃগাঙ্কমোহন চুরোটের দ্বারা একের পর এক চিত্র নির্দেশ করিতে লাগিলেন,—"এগুলো কি ছবি হয়েছে, না ছোট ছেলের রং-তুলি নিয়ে খেলা হয়েছে!"

আমার চোখের সম্মুখ হইতে যেন আর একটা ছদ্মচক্ষুর আবরণ খসিয়া পড়িল। সেই নূতন চক্ষে মৃগাঙ্কমোহনের নির্দেশ মত রজতের

ছবি দেখিয়া চমকিত হইলাম। হায় মোহ! আমার শিল্পীর চোখ কোথায় ছিল? এই ছবি দেখিয়া কেন বুঝি নাই রজত কখনও চিত্রকর হইতে পারিবে না।

আমার দিকে ফিরিয়া মৃগাঙ্ক বলিলেন, "তুমি আর একটু খাটো। ওই ছবিখানা চমৎকার হয়েছে।"

গোধূলির আলোতে আমাদেব বাড়ীর ছাদে একদিন রজতের আত্মবিস্মৃত মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। সেই আলো, সেই মূর্ত্তি আঁকিয়াছি, কেবল মুখ দিয়াছি অন্যের। আমার প্রিয়তমকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার অধিকার যে আজও পাই নাই। প্রেমের রং-এ রঙীন জগৎ সেদিন আমার তুলির রং-এ ধরা দিয়াছিল।

মৃগাঙ্ক উঠিয়া হাত বাড়াইয়া আমার ছবিখানি গ্রহণ করিলেন। "এটাতে কিছু দোষ আছে, আমি সংশোধন ক'রে দেবো। মিসেস ভাটিয়ার কাছে ফেরত পাবে। রং ধরেছো ঠিক, কিন্তু আরও চড়াতে হতো। তোমার সাহস নেই।"

মৃগাঙ্কমোহন চলিয়া গেলেন। স্থাণুর মত বসিয়া রহিলাম। আমি শিল্পী, রজত নহে। ইহা আমার অপরাধ। রজত হয়তো ক্ষমা করিতে পারিবে না। নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার আকস্মিক অবসানের দুঃখ-বিস্ময়ের মধ্যে ঈর্ষার নীলাভ ছায়া যেন তাহার মুখের উপর ভাসিতে দেখিলাম! এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার জীবনে প্রমাদ আসিবে। রজতের ভুল সহ্য করিতে পারিয়াছি, নীচতা পারিব না। ভীতি-জড়িত সংশয়ে তাহার প্রতি চাহিলাম।

সেই মুহূর্ত্ত আসিল। এই বুঝি আমার জগৎ চুরমার হইয়া যায়! গেল! গেল! কিন্তু চকিতে রজত আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "অভিনন্দন, কাঞ্চন। চিত্রকলা, বিদায়।"

৫

সেই সঙ্গে আমিও নীরবে চিত্রকলাকে বিদায় জানাইলাম।

সুদীর্ঘ চার বৎসর পরের কথা। রজত প্রথমে ডাক্তারী পড়িতে গেল। ছয়মাস পরে আবার সে পাঠ্যবস্তু পরিবর্ত্তন করিল। জার্নালিজম্ করিতে যাইয়া চলিযা আসিল। এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কয়েকদিন আনাগোনা করিয়া ক্ষান্ত হইল। রাজনীতি লইয়া নাড়াচাড়া করিল। অবশেষে বি-এ পডিযা পরীক্ষা দিয়া পাশ কবিল উকিল হইবার উদ্দেশে আইন পডিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে এম-এ।

আমি? আমিও আর্ট স্কুল ছাড়িয়া রজতের পশ্চাতে ছায়ার মত বি-এ পাশ করিয়া এম-এ ক্লাশে যোগ দিলাম। যে-আর্ট আমাকে রজতের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইবে, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই।

আজ রজতের কথায় বিস্মিত হইলাম না। তাহার এই দেশ-ভ্রমণের প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে উদিত হয়। চির-চঞ্চল চরিত্র তাহার। শান্তির আশায় সে মাঝে মাঝে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া ফেরে। একবার এইরূপ ভ্রমণ হইতে সে চুলে বাবরি ও বসনে গৈরিক লইয়া ফিরিয়াছিল। প্রশ্ন করিলাম, "তোমার কোন বান্ধবী যাচ্ছেন কি?" কেরিয়ার পরিবর্ত্তনের মত দ্রুত রজতের প্রেমজীবনেও পরিবর্ত্তন ঘটে। তবে, আজ পর্য্যন্ত সে মানসীর দেখা পায় নাই।

"না। বড একঘয়ে লাগছে।"

রজত শিলংশৈলে গেল। সুদীর্ঘ দুইমাস। তাহাব মাতাপিতাকে লিখিত পত্র হইতে নিরাপদ সংবাদ ও মাঝে মাঝে দুই একখানি

রঙিন ছবি আঁকা পোষ্টকার্ড ভিন্ন আমি তাহার বিশেষ কোন গতিবিধির নির্দ্দেশ পাইতাম না। আজ সে ফিরিল। তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে ভাড়াটে ট্যাক্সি হইতে সে অবতরণ করিল। একটু পরেই শোনা গেল সাদর ডাক তাহার কণ্ঠে আমাদের বাড়ীর একতালায়,—"কাঞ্চন!"

কোনদিন তো রজত এত তাড়াতাড়ি আমার খোঁজ করে না! হৃদয় দ্রুতস্পন্দিত হইয়া উঠিল। হয়তো দুইমাসের অদর্শন আমাকে রজতের মনে নূতন রূপ দিয়াছে। সাগ্রহে অগ্রসর হইলাম।

আমার গৃহের নির্জ্জনতায় আসিবামাত্র রজত অধীর আনন্দে বলিযা উঠিল, "কাঞ্চন, এতদিনে পেয়েছি।"

মাঝে মাঝে রজতকে কবি-ভাব আশ্রয় করে। সেই ভাবেরই বাহ্য প্রকাশ এই আচরণ মনে করিয়া সহজ সুরে প্রশ্ন করিলাম, "কি পেয়েছ; রজত?"

"তাকে! তাকে! যা খুঁজেছি এতদিন তা শিল্প নয়, সাফল্য নয়,—প্রেম। প্রেমই মনের সবচেয়ে বড় বিকাশ। জীবনে প্রথম সেই মেয়েকে দেখলাম, যে আমারও জীবনের ভার নিতে পারে।"

মনে হইল হৃদয় আমার বিন্দু বিন্দু রক্তমোচন করিতেছে। অতিকষ্টে মুখে হাসি টানিয়া বলিলাম, "তার কথা সব বলো।"

জয়তী চক্রবর্ত্তী মাতাপিতার সাহচর্য্যে শিলং প্রবাসে গিয়াছিল। জয়তীর বড় ভাই পূর্ব্বেই রজতের পরিচিত ছিলেন। এবারে নিবিড় বন্ধুত্ব হইল। জয়তীর সহিত হইল নিবিড় প্রেম। রজত এতদিনে মানসীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। সুতরাং সে বিবাহ প্রস্তাব করিল। উভয়পক্ষের জনক-জননী মত দিলেন।

ধীরে ধীরে বলিলাম, "কই, আমি তো কিছু জানিনা?" ব্যগ্রভাবে

আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া রজত বলিল, "আমি তোমাকে নিজের মুখে বলবো বলে মা-বাবাকে এ খবর দিতে নিষেধ করেছিলাম। তুমি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, কাঞ্চন। তুমি তাকে দেখলে বুঝবে আমি এতদিনে সব পেয়েছি। জয়তীও তোমাকে দেখবার জন্য ব্যস্ত। আমি আজ বিকেলে তোমাকে ওদের বাড়ী নিযে যাব। ওরাও আজ এসেছে।"

যথাসময়ে জয়তীদের বাড়ীতে অবতরণ করিলাম। সম্মুখে ফালিব মত জমিতে ক্রোটন ও গাঁদা গাছ রুটিনেব নিয়মবদ্ধতায় প্রোথিত। একতলায় বসিবার ঘবে উপনীত হইলাম।

যথানিয়মে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড সোফা-সেটী পিতলের সেণ্টারপিস্ ঘেরিয়া সজ্জিত। তাহার উপর মীনাকাজ করা অ্যাশট্রে, মশলাদানী ও পিতলের হাতীঘোড়া বিন্যস্ত। দুইকোণে লম্বা ত্রিপদীর বক্ষে শূন্য পিতলের পাত্র। একপার্শ্বে একতোড়া কাগজেব ফুল। জানালা দরজায় পুরাতন রেশমী কাপড়ে চওড়া লেস্ দিয়া পর্দ্দা ঝুলানো হইয়াছে।

জয়তীর মাতা দর্শন দিলেন। "জয়তী গেল গোসলখানায় এইমাত্র। একটু বোসো বাবা।" সদ্য পাটভাঙা সোনালী জড়িপাড শাড়ী এবং পায়ের অনভ্যস্ত চটী সামলাইতে সামলাইতে মাতা স্থূল দেহ লইয়া উপবেশন করিলেন।

চা আসিল রসগোল্লা ও শিঙাবার সঙ্গে। চায়ের অবসানে পর্দ্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল জয়তী নিজে। "এই যে রজত, ওঁকে এনেছ তো! হাউ নাইস অব ইউ!"

নির্নিমেষে জয়তীকে দেখিলাম। উজ্জ্বল সবুজ কাপড়ে চওড়া লাল সুরাটী বর্ডার বসানো, নীল জামার হাতা গলা নানাবর্ণের

রেশমের বিচিত্র ফুলপাতায় শোভিত। পায়ে কাল সোয়েটের গোড়ালি তোলা চটী। প্রখর গৌরবর্ণ গোলাপী পাউডারে গোলাপী। বৃহৎ ওষ্ঠাধরের গাঢ় রক্তিমার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কপোলও রক্তরূপ ধারণ করিয়াছে। ভ্রূ সূক্ষ্মতম রেখায় অঙ্কিত। চোখের পলক মাস্কারার দাক্ষিণ্যে শক্ত হইয়া বিস্ফারিত অক্ষিদ্বয়ের ঊর্দ্ধে নিজেদের জাহির করিতেছে। তাহার হাতের সুতীক্ষ্ণ নখর লাল-রংয়ের প্রাবল্যে চক্‌চক্‌ করিতেছে। যেন রক্তস্নাত। ওই হাতে সে আমার নিকট হইতে রজতকে ছিনাইয়া লইয়াছে। ওই রক্ত আমারি হৃদয়-শোণিত।

আমার ভীরু চোখ নামিয়া আসিতে লাগিল। রজত অন্যকে ভালবাসে—তাহাতে আমার বেদনা আছে। কিন্তু রজতের সন্ধানী মনের আদর্শ আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে আশ্বাস দেয়: 'রজত তোমাকে ভালবাসিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না, কারণ সে অসামান্য। তাইতো তুমি রজতকে ভালবাস।'

জয়তী রজতের সন্ধানের বস্তু, সে আমার শ্রদ্ধেয়া। তদ্‌গত-চিত্তে জয়তীর মুখে দম-দেওয়া গ্রামাফোনের অবিরাম বাক্যাবলী শুনিতে লাগিলাম। জয়তীর মা হাসিয়া উঠিয়া গেলেন। আত্মবিস্মৃত রজত জয়তীর পার্শ্বে সোফায় যাইয়া বসিল। স্বীকার করিতে হইল উভয়কে মানাইয়াছে।

জয়তী বলিতে লাগিল, "জানো রজত, কুলীগুলোর কাণ্ড? সেই চমৎকার টি-সেট না, ওই যে গো হলদে পাখী আঁকা—সেইটের বাক্সটা আছড়ে ফেলেছে! সব ভেঙ্গে চুরচুর! ইস, কি সস্তায় পেয়েছিলাম, না? আর, কি সুন্দরই ছিল! শুধু কাপ্‌ বেঁচেছে। ওই কুলীগুলো এমন অদ্ভুত, শোন রজত—"

দেখিলাম জয়তীর জগত আজ কাপ্ ডিসের শোকে মুহ্যমান। দার্শনিকেব একাগ্রতায়, নেতার তন্ময়তায় সে টি-সেটের অভাব ও অহেতুক ক্ষতি লইয়া দীর্ঘ আলোচনা করিতে লাগিল। রজতের উপস্থিতি অপেক্ষাও সামান্য ঘটনাটির স্মৃতি তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে বেশী। সে সত্যই মনে করিয়াছে জীবনের এই সমস্ত দিকগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই সামান্য মেয়েটির পাশে আমার অসামান্য রজতকে এত মানাইল কেন? এই পবিবেশে রজতের যোগসূত্র কোথায়?

সহসা এক অপরাহ্নের স্তিমিত আলোকদীপ্ত একটি গৃহ চোখেব সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, অসংখ্য চিত্রে সজ্জিত। কর্ণে ভাসিয়া আসিল একটী বাণী,'···তোমার চোখ নেই, মন নেই।···বজত রায়, তোমার ছবি ভালগার।'

সেই অতীতদিনে রজত সম্বন্ধে প্রকৃত উপলব্ধির চাবিকাঠি আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন মৃগাঙ্কমোহন দত্ত। তবু কেন ভুল করিয়াছিলাম! জীবনে দ্বিতীয়বার আমার ছদ্মচক্ষু প্রকৃত চক্ষু হইতে খসিয়া পড়িল।

বিদায় রজত। তুমি সন্ধানী নও, তুমি অসংযত। তোমাব মধ্যে সন্ধানের আলো জলেনা, জলে দিকভ্রষ্ট আলেয়া। মানসিক স্থৈর্য্যের অভাবে বিক্ষিপ্ত, শিশুর ন্যায় রঙীন বস্তুর সন্ধানে হাত বাড়াও। জীবনে একবারও প্রকৃত মহত্বের মুখোমুখী আসিতে তুমি পারিবেনা। তোমাকে অসামান্য ভাবিয়াছিলাম, সামান্যের মোহে ধরা দিয়া তুমি নিজের সামান্যতা প্রমাণ করিলে।

আমার ক্ষোভ নাই। আমার জন্য নীরবে এতদিন পথ চাহিয়া

প্রতীক্ষা করিতেছে আমার তুলী, আমার রং। সেই আমার সন্ধান। তুচ্ছ পুরুষের মধ্যে সে সন্ধানের শেষ নাই।

তবু, তোমার সহিত আমার মিল আছে কোথাও। এ আখ্যায়িকার গোড়ায় বলিয়াছিলাম, নাই। আছে রঞ্জত, আছে। তুমি নির্ব্বোধ। আমিও সাময়িক ভাবে নির্ব্বোধ হইয়াছিলাম।

পঞ্চশর রায়

রাজ্ঞী ক্রিশ্চিনা নিজের প্রেমিকের বিরুদ্ধে কঠোর আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিচারের আসনে বসিলে প্রেমও বিচারাধীন হয়। ইতিহাসে পঠিত ক্রিশ্চিনার উপাখ্যানের সহিত গ্রিটা গার্বোর ক্রিশ্চিনা এক হইয়া আজ আমার নয়ন সম্মুখে শাদা পর্দার কাল ছবিরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে ক্রমাগত।

—নীল সমুদ্রের বক্ষে অর্ণবপোত। ক্রিশ্চিনা যাত্রা করিয়াছেন ইটালি অভিমুখে। গুষ্টাভাস আডলফাসকে সিংহাসন দিয়া ক্রিশ্চিনা রাজ্য ত্যাগ করিলেন। ইতিহাস বিস্তৃত বর্ণনা দেয় নাই। প্রণয়ীর উদ্দেশে ক্রিশ্চিনা রাজ্য ত্যাগ করিলেন তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য। কিন্তু তাহা হইল না। তাহার পূর্ব্বেই রাজরোষ উপলক্ষ্য হইয়া সেই প্রেমিকের মৃত্যু ঘটাইল। মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ক্রিশ্চিনা ধীরে ধীরে বলিলেন—'আমাকে তো চলিতেই হইবে।'

আজ আমিও আমার একমাত্র প্রিয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমার মতবাদ ব্যক্ত করিতেছি। কিন্তু ক্রিশ্চিনার সহিত আমার প্রভেদ, ক্রিশ্চিনা অপর পক্ষের নিকট হইতে অপরিসীম প্রেম লাভ করিয়াছিলেন। সেই স্মৃতি আজন্ম তাঁহার জীবনকে পুষ্পসৌরভসমাকুল করিয়া রাখিত। কিন্তু আমি? আমার প্রিয়তম ব্যক্তি আমার প্রেমিক নহে। তিনি আমাকে ভালবাসেন নাই। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আমি সুইডেনের অসামান্যা রাজ্ঞী নহি, মিলিটারী অফিসের রূপহীনা কেরাণী মাত্র।

তাহাতে ক্ষতি ছিল না। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলাম, প্রেম জানাই নাই! দূর হইতে তাঁহাকে পূজা করিয়া তাঁহার ভক্তের দলের অন্যতম হইয়া থাকিয়াও আমার জীবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, আজ তিনি আমার কাছে মৃত। তবু আমাব জীবনধাবণ করিতে হইবে! আমাকে চলিতেই হইবে।

যখন স্কুলে পড়ি তখন চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের একটি অভিজ্ঞতা আমার জীবনের সুর যেন বাঁধিয়া দিল। স্কুল হইতে বহু ছাত্রী আমরা শিক্ষয়িত্রীদের সহিত সার্কাস দেখিতে গিয়াছিলাম। শীতের সন্ধ্যা, ট্রামেব জন্য আমরা পথের ধারে অপেক্ষা করিতেছিলাম। পাশেই একটি ছায়াচিত্রগৃহ। সহসা দেখিলাম প্রতীক্ষমান মোটরগাড়ীর দ্বারে হাত রাখিয়া জনতা-পরিবেষ্টিত অবস্থায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কথা বলিতেছেন। শুভ্র উত্তরীয়ের উপর দিয়া কণ্ঠে লম্বিত রহিয়াছে শাদা গোড়ে মালা। বিশাল দুই নয়নে প্রতিভার জ্যোতি। ললাটে, অধরে বিশিষ্টতার ছাপ, মনুষ্য সমাজে নৃপতির যোগ্যতা আছে। তিনি!

সকলেই, বিশেষতঃ বয়স্কা ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীরা, জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন। আমার সোৎসুক প্রশ্নের উত্তরে একজন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী বলিল, "ইনি যে এ দেশের বড় সাহিত্যিক। ইংরেজি বাংলা দু'খানা কাগজেব সম্পাদক। কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার—একাধারে সব। পঞ্চশর রায়।"

পঞ্চশর রায়! মনে পড়িয়া গেল আমার দাদার পড়িবার টেবিলে একখানা কাব্যগ্রন্থ দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে না বুঝিয়াও গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করিয়াছি। পঞ্চশর রায়ের একটি কবিতার পংক্তি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল :—

—আমি তোমাদের, তোমরা আমার, এই মোর পরিচয়।—

কবির কথায় নিজের সহিত তাঁহার যোগসূত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাকে আপনাব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম।

সেই প্রথম আমার জীবনে পুরুষের পূজা আরম্ভ হইল।

তাহার সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে পঞ্চশর রায়ের সহিত মিশিবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য লাভ কবিলাম। আমাদের পার্টির একখানা মাসিকপত্র আছে, তাহাব পূজাসংখ্যা-রচনার জন্য পঞ্চশর বায়েব দ্বারস্থ হইয়াছিলাম।

বিশাল অফিস। প্রবেশ কবিতে হৃৎকম্প হইল। তাঁহাব সম্মুখে উপনীত হইতে আবার অন্তর্নিহিত গোপন শ্রদ্ধা আমাব কণ্ঠরোধ করিয়া ধবিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ফাইল হইতে মুখ তুলিয়া পঞ্চশব বায় বলিলেন. "কি চাই?"

অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উত্তর দিলাম, "আমাদের পত্রিকার পূজোসংখ্যায একটা লেখা—"

বাধা দিয়া তিনি সবেগে বলিযা উঠিলেন, "অসম্ভব। লেখার সময় আমার নেই।" দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সভয়ে বলিলাম, "আমি—পার্টির লোক। সেখানে সভাপতিত্ব কবতে যেয়ে আপনি একটা লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন।"

"ও"—চকিতে পঞ্চশরের কণ্ঠে আপ্যায়নেব সুর দেখা দিল,—"তাই বলুন। আমাকে এত যে-সে লোক এসে বিরক্ত করে যে কি বলবো। বসুন, বসুন। ওরে একখানা চেয়ার—"

বসিবার আমন্ত্রণ পাইয়া ধন্য হইলাম।

তাহার পর হইতে আমার বাস্তবলোক, আমার ধ্যানলোক, আচ্ছন্ন করিয়া রহিলেন পঞ্চশর। তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিবার অধিকার আমার চরম প্রাপ্তি হইল। অনুগতা শিষ্যা হইয়া তাঁহার সামান্য কাজে নিজেকে প্রযুক্ত করিতে পারিয়া তাঁহার মতবাদ গলার জোরে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়া এই নূতন দেবতার উপাসনায় আমার দিন কাটিতে লাগিল। আজ নিস্পৃহ চিত্তে বসিয়া নির্লিপ্ত মনোযোগে খণ্ড খণ্ড ঘটনা-সংস্থানে আমার সহিত তাঁহার পরিচয়ের যথার্থ্য রূপটি নিজের সম্মুখে নিজেই টানিয়া আনিতেছি। অতিক্রম করিতে পারিতেছিনা। তখন যাহা প্রতিভার স্বাভাবিক অস্বাভাবিকত্ব বলিয়া মনে হইয়াছিল আজ অন্যরূপে সেইগুলি ফিরিয়া দাঁড়াইতেছে। শেষ হইতে নূতন করিয়া প্রথম দেখিবার শিক্ষা, হে গুরুদেব, তুমিই দিয়াছ।

ছোট ছোট দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়া নাম হইয়াছিল। সেগুলি পার্টির পত্রিকায় উপর্য্যুপরি প্রকাশিত হইলেও পঞ্চশর কখনও উল্লেখ করেন নাই। তখন তাঁহার সহিত প্রায় একবছর ঘনিষ্ঠ আলাপ হইয়াছে। অফিস-ফেরৎ প্রায়ই তাঁহার অফিসে যাই। তাঁহার কপি করিবার কাজকর্ম্ম করিয়া দিয়া হাতের লেখা দুই একটি টুকরা লইয়া বাড়ী ফিরি। তাঁহার ফরমাসমত দুরূহ জটীল তথ্য বড় বড় বই হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলীর ভিত্তির মালমশলা জোগাই। সময়বিশেষে প্রুফও দেখি, তাঁহার কাজ উপলক্ষে এখানে ওখানে ছোটাছুটি করি। তাঁহার সাহিত্য-সমিতির জন্ম বাড়ী বাড়ী চাঁদা তুলি। নিরালা নিশীথে তাঁহার

কাব্য আবৃত্তি করিয়া গগনের চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া নিঃশ্বাস ফেলি। তাঁহার ছায়ার প্রতিচ্ছায়া হইয়া দিন কাটাইয়া ভাবি,—'স্বর্গ এইখানে।'

প্রতিদানে কিছু চাহিবার কথা মনে আসে নাই। চাহিবার সাহসও বোধ হয় মনের ছিল না। শেলীর লেখায় খদ্যোতের চন্দ্রকামনা নিজের উপর আরোপ করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম। চতুর্দ্দশ বৎসরে প্রবল আকর্ষণ আজ অলঙ্ঘ্য শক্তি হইয়াছে। সেই তরুণ যুবক পঞ্চশর রায় আজ প্রৌঢ়। তাঁহার ললাটের পার্শ্বে কাল চুলে শাদা ছোপ ধরিয়াছে। পুত্র-কন্যাপরিবৃত হইয়া ধর্ম্মপত্নীর সহিত মহানন্দে তিনি সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও এ মোহান্ধ মনের কিছুমাত্র মোহবিচ্যুতি ঘটিল না।

দেড় বছর পরে সঙ্কোচের সহিত নিজের একটি লেখা তাঁহাকে দিলাম—"এই লেখাটা একটু পড়ে দেখবেন? যদি ভাল লাগে তাহ'লে আপনার কাগজে—"

উজ্জ্বল-ভাস্বর দৃষ্টি কিছুক্ষণ আমার প্রতি মেলিয়া পঞ্চশর নীরবে হস্ত প্রসারণ করিলেন। মনে হইল অপরাধ করিলাম। যাঁহার রচনাবলী আমার জীবন-গীতা হইয়া রহিয়াছে, আমার লেখার একটি অক্ষরও পড়িবার সময় তাঁহার হয়তো নাই। অপ্রতিভ স্বরে বলিলাম, "যদি আপনার সময় না থাকে—,"

কি ভাবিয়া পঞ্চশর হাসিমুখে উত্তর দিলেন,—"সময় আমার কখনও থাকে না, তা তুমি জান, লীলা। তবে তোমার লেখা দেখার সময় আমার করতেই হবে।"

সহসা আপাদমস্তক পুলকে প্লাবিত হইয়া গেল। পঞ্চশরের কণ্ঠের কোমলতায় কিসের যেন সন্ধান খুঁজিতে মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। দুরাশার স্বপ্ন গাঁথিবার সূত্র তাঁহার সহসা কোমল কণ্ঠস্বর

যেন আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিল। জানি, স্থান-কাল-পাত্র হিসাব-নিকাশ করিয়া পঞ্চশরের দুর্লভ বাগ্মী কণ্ঠের উত্থানপতন তিনি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। তবে আমি? আমি সেই বহুপুরাতন লীলা, তাঁহার একজন অন্ধভক্ত, চিরদিনই যে অন্ধ থাকিয়া যাইবে। তাহাব জন্ম কোমলতাব মুক্তাখণ্ড ছড়াইবার প্রয়োজন ছিল না। তবু এই আকস্মিক দানে আমার কাঙালী চিত্ত ছেঁড়া-কাঁথায় লক্ষ মুদ্রাব স্বপ্নে তন্ময় হইয়া উঠিল।

সলজ্জদৃষ্টিতে পঞ্চশরের দিকে চাহিলাম। টেলিফোনের রিসিভার হস্তে পাকা ব্যবসাদারী চালে পঞ্চশর তাঁহার এক বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত কথা আরম্ভ করিয়াছেন। কয়েকদিন পরেই পঞ্চশরের জয়ন্তী হইবে। সে জয়ন্তীর প্রধান উদ্যোক্তা পঞ্চশব নিজে। আমার রচনাটি টেবিলে পড়িয়া রহিল। আমি তাঁহাব কাগজে নিজের নামের ছাপা অক্ষর দেখিবাব লোভে লেখা দেই নাই, তিনি আমার রচনা নিজে পড়িবেন, ইহাই আমার কাম্য ছিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম। অনেক সময়ে পাত্রপাত্রী নির্বিশেষে পঞ্চশর অস্ত্রাদি প্রয়োগ করিয়া ধার দিয়া রাখেন। মনে ঈশপের নীতিকথাটি উদিত হইল,—"তোমাব যাহা ক্রীড়া, আমার তাহা মৃত্যু।"

ছয়মাস অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। পঞ্চশরের কাগজে লেখাটি দেখিলাম না, মুখেও তিনি কিছুই বলিলেন না। দীর্ঘ ব্যাকুল প্রতীক্ষার পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

ললাটে চক্ষু তুলিয়া পঞ্চশর বলিলেন, "হ্যাঁ, পড়েছি বৈ কি। বেশ হয়েছে। তোমার মধ্যে ভাব আছে, কিন্তু আর একটু সংযত হওয়া প্রয়োজন। দুই এক জায়গায় ভাব বিলাস হয়ে গেছে। সেগুলো বদলে নিয়ে এস। দেখিয়ে দিচ্ছি।"

দেরাজ খুলিয়া পঞ্চশর বৃথা অন্বেষণ করিলেন,—"তাই তো, কোথায় গেল? পড়ে রাখলাম সে দিন এখানেই তো? পিনাকী?"

তাঁহার সেক্রেটারী—কাম—কর্ম্মচারী পিনাকী সবিনয়ে জানাইল,—"সেদিন তো আপনার দেখবার সময় হলো না। আপনি বেরিয়ে গেলেন। এখানেই পড়ে রইলো লেখাটা। লেখাটা হারিয়ে যাবে ভয়ে আমার দেরাজে তুলে রেখেছিলাম। সেখানেই আছে।"

ব্যস্ত-ত্রস্তভাবে পঞ্চশর বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা। খুব করেছ। এখন এনে দাও তো সেটা। যত সব হয়েছে আমার।"

আমার দিকে সকৌতুক হাস্যের তীর প্রেরণ করিয়া পঞ্চশর কহিলেন—"রাগ করলে, লীলা? মিথ্যা আমি বলিনি। তোমাকে এতদিন দেখেছি। তোমার লেখা না পড়েই আমি সমালোচনা করতে পারি। সত্যি, এ কয়মাস এত ব্যস্ত ছিলাম! লক্ষ্মী মেয়ে, রাগ কোরনা।"

তাঁহার উপরে রাগ করিবার অথবা তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতা তখনও আমার হয় নাই।

পঞ্চশরের ভক্তশিষ্যা এবং বান্ধবীর অভাব ছিল না। হত্যা যাহার বিলাস, সে প্রয়োজন না থাকিলেও অযথা তীরক্ষেপ করিয়া নিরীহ প্রাণীর জীবনের অবসান ঘটায়। সেই সমস্ত শবদেহে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না; পথপার্শ্বে তাহারা ধূলায় অবলুণ্ঠিত হয়। ইহা শিকারীর নিজ অস্ত্রাদি পরীক্ষা করিবার পক্ষেও প্রয়োজনীয়। ইহাতে তাহার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। পঞ্চশরের দেখিতাম নারীমাত্রের প্রতি অব্যর্থ শরক্ষেপ। তাহাদের তাঁহার প্রয়োজন নাই, তাহারা তাঁহার

নিকট হইতে কিছুমাত্র নিঃস্বার্থ প্রতিদান আশা করিতে পারে না। তবু, কেবল অভ্যাসানুযায়ী পঞ্চশরের প্রেম করিবার বাসন মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাহিত্যিক হিসাবে সমাজের সকল স্তরের নারীর সম্পর্কে তিনি আসিতেন। প্রত্যেককে কোমল সুরে বাজাইয়া যন্ত্রসঙ্গীতে নিজের দক্ষতার প্রমাণ পাইয়া তবে তিনি শান্ত হইতেন। নহিলে তাঁহার আত্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হইত, তিনি অশান্তি বোধ করিতেন।

তাহাতে তাঁহার উপর আমার অশ্রদ্ধা হয় নাই। শিল্পীর জীবনে অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক প্রেম। নিত্য নবশিখার সন্ধানে ধাবমান পঞ্চশরকে 'অশান্ত প্রতিভা' আখ্যা দিয়া নিজের নিকট তাঁহাকে লেবেল আঁটিয়া লইলাম। আমি তাঁহার অনুগতা সেবিকা মাত্র। আমার বিকার ঘটিল না।

পঞ্চশরের মহিলা ভক্তবৃন্দ তাঁহার জন্মতিথির উৎসব করিল, প্রত্যেকেই তাঁহাকে নানাবিধ উপহার দিল।

আমি চিন্তায় পড়িলাম। আমি এমন কিছু দিতে চাই যাহা তাঁহার নিত্য ব্যবহারে তাঁহার সান্নিধ্যে থাকে, যাহা আমার নীরব সেবার সাক্ষ্য বহন করিতে পারে। অথচ শত ধনীকন্যা, ধনীপত্নী রূপসীদের উপহার-প্রাচুর্য্যে আমারি মত পিছনে থাকিয়া সেই উপহার আমার গোপন প্রেমের মূক বাণী জানাইতে পারে।

যুদ্ধের বাজার। অনেক বিবেচনার পর পনেরো টাকা দিয়া একগজ সিল্ক কিনিয়া আনিলাম। অতিযত্নে সেলাই শিখিয়া রুমাল একখানি প্রস্তুত করিলাম। সেলাই শিখিবার অবকাশ আমার ছিল না, পঞ্চশরের পাদপীঠতলে হাজিরা দেওয়া এবং জীবিকা সংস্থানের কাজটুকু করিয়া যাওয়া, ইহাই জীবনের লক্ষ্য হইয়াছিল। রাত্রি জাগিয়া অনভ্যস্ত হস্তে নানা লতাফুল অঙ্কিত করিয়া রবীন্দ্রনাথের

কবিতার পংক্তি চতুষ্টয় লিখিয়া রুমালখানি তাঁহাকে উপহার দিলাম।

সেই বস্তুটির পরিণতি আজ মনে পড়িয়া আত্মগ্লানিতে হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিতেছে।

পঞ্চশরের নবতমা শিষ্যা অনুপমা লাহিড়ীর সহিত একটি সভায় আলাপ হইয়া গেল। সে রূপে সত্যই অনুপমা। আমাদের পার্টিতে তাহার পবে অনুপমা যোগদান করিল।

একদিন পার্টির এক মিটিংয়ের শেষে অনুপমা টাকা বাহির কবিবাব জন্য হাত-ব্যাগ খুলিতে তাহার ব্যাগের মধ্যের রুমালটি চোখে পড়িল। টানিয়া লইয়া দেখিলাম—সেই ঈষৎ-নীল জমিব উপর গোলাপী সুতার কারুকার্য্য, রবীন্দ্রনাথের কবিতা রেশমে গাঁথা—

"না চাহিতে না জানিতে যেই উপহার।
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান।
হোক ফুল, হোক তাহা গান।"

ভুল হইবার কিছুই নাই। প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এমন সৌখীন জিনিষটি পেলেন কোথা থেকে, মিস্ লাহিড়ী?"

অবহেলায় রুমালখানি হাতব্যাগে নিক্ষেপ করিয়া অনুপমা কহিল, "এর এক ইতিহাস আছে। একদিন পঞ্চশর রায় আমাদের বাড়ীতে এই রুমালখানা বার করে মুখ মুচ্ছিলেন। আমি সুন্দর বলায় তক্ষুণি আমার হাতে গুঁজে দিলেন। বল্লেন, 'একবার সুন্দর বলেছ, এ তোমায় নিতেই হবে। সুন্দর সুন্দরীর হাতেই মানায়'।" উচ্চস্বরে হাসিয়া অনুপমা বলিল, "এই সব বড়লোকেরা মনের দিক থেকে কি রকম দীন। একঘর ছেলেপিলে নিয়ে এই বয়সেও ভাঁড়ামী যায় না। সামান্য

একখানা রুমাল দেবেন, তাতেও কি উচ্ছ্বাস!" অনুপমা তাহার ভাবী জমিদার স্বামীর গাড়ীর হর্ণে চকিত হইয়া উঠিয়া গেল।

পার্টির অফিসের চায়ের দাগে রেখাঙ্কিত টেবিলে আমি মাথা রাখিলাম। অনুপমা লাহিড়ী, তুমি জান না ওই সামান্য জিনিষ কত আত্মত্যাগে, কত ভালবাসায় অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে। সামান্য পনেরোটি টাকা মাত্র। কিন্তু আমার হৃদয়ের পঞ্চদশ বিন্দু রক্ত। অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের সংসারে ওই পনেরোটি টাকা পনেরোটি মোহর। উহার জন্য বহুদিন অফিসে লাঞ্চ না খাইয়া, ছেঁড়া জুতা পরিয়া কাটাইয়াছি। গোলাপী রেশম অনভ্যস্ত হস্তের অঙ্গুলি-সঞ্চালনে গভীর রজনীর জাগরণের কাহিনী বলিয়া দিতেছে। ও রুমাল সামান্য নহে।

অজস্র খণ্ড খণ্ড কাহিনী মনের নিভৃত কোণ হইতে বাহির হইয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। আমি সে সব কাহিনী স্বেচ্ছায় মনে করিতে চাই বা না চাই, তাহারা আমাকে দেখা দিবেই। গ্রীক পুরাণের ড্রাগনের দন্ত। একটি হইতে সহস্রের উদ্ভব। একটি বিষাক্ত স্মরণ শত সহস্রকে ডাকিয়া আনিতেছে। নিজেদের মধ্যে তাহারা ড্রাগনদন্ত হইতে উৎপন্ন যোদ্ধৃমণ্ডলীর মত হানাহানি, কাটাকাটি করিতেছে। আমার মনের মধ্যে এই অবিরাম সংগ্রামে আমি নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া আছি। কোনও কাহিনী এড়াইবার সাধ্য আমার নাই। আমি যে আজ বিচারাসনে বসিয়াছি। এ আসনের মর্য্যাদা আমাকে রক্ষা করিতে হইবে।

আমার প্রতিবেশী নীরদ দত্ত একখানি ছোট মাসিকপত্র বাহির

করিল। তাহারা কয়েকজন বেকার যুবক নিজেদের মধ্য হইতে চাঁদা তুলিয়া নিজেদের সাহিত্যানুরাগ তৃপ্ত করিবার জন্য এবং সময় কাটাইবার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের দলে স্বতঃসিদ্ধভাবে আমি কিয়ৎপরিমাণে ভুক্ত হইয়া পড়িলাম।

নীরদের পত্রিকার উপর পঞ্চশর রায় যথেচ্ছা গালি বর্ষণ করিলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া, মহতের মর্য্যাদাহানির অপরাধে তিনি সাহিত্য সীমানার বহির্দেশে নীরদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নাই। পঞ্চশরের কঠোর লেখনীর উপর আমার অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল। জনগণের মঙ্গলের জন্য সে লেখনী সময়ে সময়ে বিষোদ্গীরণ করে। ব্যাঙের ছাতার মত যে সব সাহিত্যিক গলিতে গলিতে জন্মিয়া প্রাত্যহিক শাক-সব্জীর ডালায় অখাদ্য বিষাক্ত শস্যরূপে দেখা দিতেছে তাহাদের ছুঁড়িয়া ফেলাই উচিত। অন্যথায় অজ্ঞানের খাদ্যসম্ভার বিষাক্ত হইয়া উঠিতে পারে। নীরদের মত বহু তরুণ এদেশে আছে, যাহাদের সৃষ্টির ক্ষমতা নাই, ধ্বংসের বিলাস আছে। যৌবনের অদম্য তেজ রক্তের মধ্যে অনুভব করিয়া তাহারা নিজেদের ক্ষণজন্মা এবং সবজান্তা বলিয়া ভাবে। ন্যায় ও অন্যায়ভাবে তাহাদিগকে আক্রমণে পঞ্চশরের সাহসেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

নীরদের সহিত মাঝে মাঝে সাহিত্যসভা ইত্যাদি স্থানে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। ইতিপূর্ব্বে কদাচিৎ সুযোগ ঘটিত। পঞ্চশরের অতি নিকটে যাহারা থাকিতাম, তাহাদের বিষয়ে তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক চালনা করেন নাই। তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না। ঐ মস্তিষ্কের তো আমার মত নগণ্য ব্যক্তির মঙ্গল চিন্তার জন্য উদ্ভব হয় নাই।

নীরদ আমারি মত পরিচয়হীন নগণ্য ব্যক্তি। সুতরাং সাধারণের সহিত আমার পরিচিতি করাইয়া দিবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার ফলে দুই একটি পত্রিকা হইতে আমার প্রবন্ধ চাহিয়া আমন্ত্রণ আসিল, এবং দুই একটি নবগঠিত সমিতি আমাকে সভ্য করিয়া লইতে আগ্রহ দেখাইল।

সামান্য মনোযোগ মাত্র। কিন্তু আমার বঞ্চিত, ভীরু চিত্তের সঞ্জীবনী মন্ত্র। পঞ্চশরের পদলগ্না ছায়া ভিন্ন আমার নিজেরও যে একটা পৃথক সত্তা আছে, জীবনে প্রথম উপলব্ধি করিতে পারিলাম। বিশাল সহকারের মূল বেষ্টন করিয়া যে লতিকা আত্মবিস্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়া থাকে, সহকারের আশ্রয় ভিন্ন তাহার অপর জীবন তাহার কল্পনার বাহিরে হইলেও সম্ভব। আমারও আত্মবিস্মৃত চিত্তে প্রথম অনুভূতি জাগিতে চাহিল, তবে কি আমারও সমাজে কোন স্বতন্ত্র মূল্য আছে?

একটি সভায় পঞ্চশরের নিকটে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সভা অন্তে পঞ্চশর সহসা বাণীগঞ্জের মহারাজাকে দেখিয়া পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তাঁহার দিকে একপদ অগ্রসর হওয়া মাত্র শুনিলাম আমার পিছনে চাপাগলায় কে যেন বলিতেছে,—"এই চললো গাধাবোট ষ্টীমারের পেছনে। সব সময়ে পঞ্চশর রায়ের পেছনে এই মেয়েটা কুকুরের মত বেড়ায়। বোঝে না পঞ্চশর রায় চায় নিত্য নূতন। কবে কি ঘটেছিল ভুলে যাও বাছা।"

এই অভদ্র, অশিষ্ট ভাষা কাহার মুখ হইতে বাহির হইতেছে দেখিবার জন্য পিছনে তাকাইলাম। মাল বোঝাই গরুর গাড়ীর মত হেলিয়া দুলিয়া দুইটি স্থূলকায় ব্যক্তি গিলা করা আদ্দির পাঞ্জাবী এবং

কড়া ইস্ত্রির সিল্কের পিরানে আবৃত হইয়া চলিয়াছে দ্বার অভিমুখে। বক্ষ-বিলম্বিত সোনার ঘড়ির শিকলি, হস্তের অঙ্গুরীয়ের নীলা-পলা-হীরা দেখিয়া তাহাদের অর্থ ও তাহার প্রচার ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

অপমানে, দুঃখে চোখে জল আসিল। এ অপমান কেবল আমাকে নয়, স্বয়ং পঞ্চশরকেও। সুতরাং অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। মহারাজের সহিত মোলাকাৎ করিয়া ফেরামাত্র কথাগুলি পঞ্চশরের কর্ণগোচর করিয়া দিলাম। পঞ্চশর উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন,— "কি অন্যায়। তাদের দেখাতে পার?"

লোক দুইটি দরজার নিকটে তখনও দাঁড়াইয়া অন্যান্য অভ্যাগতদের সহিত কথা বলিতেছিল।

তাহাদের দিকে চাহিয়া পঞ্চশর নিবিয়া গেলেন—"ওঃ ওরা যে মেসার্স কাঞ্জিলালের দুই খোদ কর্তা।"

কিছুদিন পরে দেখিলাম প্রসিদ্ধ প্রকাশক মেসার্স কাঞ্জিলালের জয়গাথায় পঞ্চশর আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন। বোঝা গেল স্বনামধন্য প্রকাশকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পঞ্চশর তাঁহার অখ্যাতনামা সেবিকার মান-অপমানের কথা সহজেই বিস্মৃত হইতে পারিয়াছেন।

প্রবন্ধ লিখিয়া কিছু নাম হইতেছিল। একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা নারী আন্দোলন সম্পর্কে আমার এক সদ্য প্রকাশিত প্রবন্ধকে কঠোর সমালোচনার ছুরিকাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহার নানা কদর্থ করিয়াছে। আমি যাহা বলিতে চাহি নাই তাহারা তাহাই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত।

স্বতঃই পঞ্চশরের কথা মনে জাগিল। তাঁহার বন্ধু বান্ধবদের

মানবরক্ষার্থে সর্ব্বদা তাঁহার প্রসিদ্ধ পত্রিকা দুইখানি প্রস্তুত থাকে। তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম।

পঞ্চশর অট্টহাস্য করিলেন,—"আরে ছি লীলা, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এর আবার প্রতিবাদ কি? প্রতিবাদ নীরবতা। তুমি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠছো, দুঃখ কোরনা।"

নীরবে চলিয়া আসিলাম। বাড়ী ফিরিয়া দেখি নীরদ আমার ঘরে টেবিলে বসিয়া তেলেভাজা বেগুনী সহযোগে তেল-নুন-মাখা মুড়ি খাইতেছে এবং দ্রুতবেগে কি যেন লিখিতেছে। তাহার সম্মুখে এক পাত্র কড়া চা এবং বার্ম্মা চুরুট।

"আসুন লীলা মিত্তির, আপনার অনুপস্থিতিতে আমার আতিথ্যের ক্রটী হয়নি দেখছেনই। এই লেখাটা দেখুন দেখি; প্রায় শেষ করে এনেছি। আপনার প্রবন্ধের যা জঘন্য সমালোচনা করেছে এই কাগজটায়! কড়া প্রতিবাদ হওয়া উচিত, আমি করছি; এই সংখ্যায় যাবে।"

আমার কণ্ঠে বাষ্পোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়া আসিল! নীরোদ আমারি মত দুর্ব্বল। তবু দুর্ব্বলের সাহায্য করিতে দুর্ব্বলই অগ্রসর হইয়া আসিল। সবলের দ্বারে বৃথা প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইলাম। যদি আমি আজ পঞ্চশরের অন্ধ স্তাবক মাত্র না হইয়া তাঁহার প্রভাবশালী বন্ধু হইতাম, যাহার উপর তাঁহার কোনও ভবিষ্যতের আশা থাকিত, তবে তিনি তাঁহার চিরাচরিত প্রথায় সমরে অবতরণ করিতেন। আমি একটি তুচ্ছ অফিসের তুচ্ছতম কেরাণী মাত্র। সুতরাং আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বড় প্রকাশক এবং সুবিখ্যাত পত্রিকার সহিত বিবাদ করিতে চান না। তাঁহার ব্রত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলকে রক্ষা নহে, সবলের পৃষ্ঠপোষকতা। চকিতে ঐ কথা মনে হওয়ায় মনকে

চাপিয়া ধরিলাম। আমার জীবনে পঞ্চশরের আসন দেবতারূপে। নিজের কোন মূল্যই আমি দিতে চাহি না।

ড্রাগনের দন্ত তখনও বপন হয় নাই। আমারি চোখের সম্মুখে বপন হইল, দাঁড়াইয়া দেখিয়া চিরদিনের মত নিজের মধ্যে সংগ্রাম বহন করিয়া চলিয়া আসিলাম।

রবিবার অপরাহ্নে পঞ্চশরের অফিসে উপনীত হইলাম। তাঁহার নূতন নাটকখানি কপি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

হাতের ঝর্ণা-কলম নামাইয়া পঞ্চশর আমার প্রতি চাহিয়া হাসিলেন, অনাবিল স্নেহের অকৃত্রিম হাস্য। এরূপ হাসি তিনি সহজে কাহাকেও উপহার দেন না।

"আজ নাটক টোকা হবে না লীলা, এখনি কয়েকজন লোক আসবেন এখানে। কথা-বার্ত্তার গোলমালে আমি দেখে দিতে পারব না। তার চেয়ে তুমি নূতন কি লিখছ বল শুনি।"

আশ্চর্য্য হইলাম। আমার রচনা সম্পর্কে পঞ্চশরের কোন আগ্রহ কোনদিন প্রকাশ পায় নাই। আজ তাঁহার কণ্ঠে কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন তোষামোদের সুর! তাহার ভঙ্গিতে ব্যাকুল আশ্রয় অন্বেষণ!

একটি সুদর্শন যুবক প্রবেশ করিল। ছাত্র-সমিতির সম্পাদক। পঞ্চশর সবরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বসাইয়া সাগ্রহে আলাপ করিতে লাগিলেন।

বিস্মিত হইলাম। ইহাদের কাহাকেও তো পঞ্চশর মানুষ বলিয়া মনে করিতেন না। প্রচণ্ড তাচ্ছিল্য তাঁহার ঘৃণারি রূপান্তর ছিল।

সহসা নীরদের নাম শুনিয়া সচকিত হইলাম। নীরদ সম্প্রতি তাহার পত্রিকায় পঞ্চশর প্রমু্খ তাঁহার দলীয় সাহিত্যিকগুলীর

বিশদ নিন্দা করিয়াছে। পঞ্চশর বলিতেছেন,—"দেখ দেখি আস্পর্দ্ধা? আমাদের কাছ থেকে লেখা শিখে আমাদেরই বিরুদ্ধাচরণ করে।"

যুবক বলিল, "হ্যাঁ ওই ধরণের লেখা কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আপনার কাগজেই বের হয়।"

"তা হোক। তখন ক্ষেত্র ছিল। এখন দেশের চিন্তাবীরদের নিয়ে এমন বিদ্রূপ করার কোন অজুহাতই নেই।"

"আমাদের কাগজে আমরা এর পাল্টা জবাব লিখবো। দেখবেন বাছাধনদের কি শাস্তি করি। ও কাগজ আর চালাতে হবে না।"

পঞ্চশরের বিশাল প্রতিভাদীপ্ত চক্ষু দুইটি মুহূর্ত্তের জন্য পৈশাচিক আনন্দে জ্বলিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া তিনি সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "সে তোমরা যা ভাল বোঝ, কোর। এখন বল দেখি আমার লেটেষ্ট উপন্যাস কেমন লাগল?"

"চমৎকার, এমন লেখা কারুর কলম দিয়ে আর বেরোয়নি।"

"যাক, তোমাদের ভাল লাগলেই ভাল। ও বই তোমাদের জন্যেই লেখা। আর শোন, তোমার কবিতার বই দুখানা আমাকে পাঠিয়ে দিও। আমি ভাল করে পড়ে নিজে সমালোচনা করবো।"

কৃতকৃতার্থ হইয়া যুবক বিদায় লইল।

হায়, আমি কাহাকে পূজা করিয়াছি? এ তো দুর্ব্বল, অতি দুর্ব্বল। বাহিরে শক্তির আড়ম্বর ইহার ছদ্মবেশ মাত্র। যে সম্মান ও মর্য্যাদার রাজসিংহাসনে এই অভিনেতা আত্মপ্রসন্নচিত্তে উপবিষ্ট ছিল, সেই আসনের এক কোণায় সামান্য একটু টান পড়িবামাত্র এ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজকীয় গাম্ভীর্য্যে উপেক্ষা ইহার সাধ্যায়ত্ত নহে। আমার নিকট, ছাত্রসমিতির সম্পাদকের নিকট আজ ইহার মত ব্যক্তি ভিক্ষুক-হস্ত প্রসারণ করিতেছে,—'তোমরা

আমাকে আমার আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া দাও, আমাকে রাজাসনচ্যুত করিও না। তোমরা বল আমি আমার আসনে প্রতিষ্ঠিত আছি।—'

পঞ্চশর রিসিভার তুলিয়া টেলিফোনে তাঁহার বন্ধুকে ডাকিলেন। মোহশূন্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া তাঁহার বচন-বিন্যাস শুনিতে লাগিলাম। "কি অন্যায়, না?...আমরা কেউ ও কাগজের কোন সমর্থন করব না...লেখা যা'তে ওরা না পায়...পাব্লিক কি মনে করবে? ...কি আশ্চর্য্য...আমরা কি আর পাব্লিকের ধার ধারি...—"

ষড়যন্ত্র শেষ করিয়া পঞ্চশর আমার দিকে ফিরিয়া তাঁহার দুর্লভ কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "আজ বড় ব্যস্ত আছি। লীলা, তুমি এখন বাড়ী যাও।"

"আমি যাচ্ছি। প্রণাম।"

অনভ্যস্ত প্রণামজ্ঞাপনে পঞ্চশর বিস্মিত হইয়া চাহিলেন। তাঁহার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। অফিসের স্প্রিংএর দরজা আমার পশ্চাৎদেশে ছুটিয়া বন্ধ হইয়া গেল।

পঞ্চশর রায়, আজ তুমি দেবতার আসনে বসিয়াছ। কিন্তু তোমাকে দেবতা করিয়াছে কে জান? আমি, আমরা। আজ তুমি পাব্লিকের ধার ধারনা। কিন্তু তোমার রাজাসন এই জনগণের অস্থি-পঞ্জরের উপর স্থাপিত, তোমার জয়যাত্রার রথের নিম্নে বক্ষ পাতিয়া দিয়াছি আমরা।

তোমাকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এই নামহীন-গোত্রহীনের দল। তোমার জয়ন্তী উৎসবে বৃষ্টিতে ভিজিয়া পথে পথে আমরা হ্যাণ্ডবিল বিলি করিয়াছি, চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইয়া তোমার রচনার প্রচার করিয়াছি। না খাইয়া তোমার গ্রন্থাবলী কিনিয়া

কণ্ঠস্থ করিয়াছি। গৃহে তোমার চিত্র লম্বিত করিয়া বেলফুলের মালায় সাজাইয়াছি। একবার আমাকে চক্ষে দেখিবার জন্য ক্রোশ ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটিয়াছি। তবে তুমি দেবতা হইয়াছ। আমাদের নিকট তোমার ঋণ অনেক।

কিন্তু ভুলিওনা পঞ্চশর রায়, ওই দেবতার আসন হইতে এক নিমেষে তোমাকে টানিয়া ফেলিতে পারি—আমরাই। বহুদিন পূর্ব্বে বহুলোককে তুমি এইভাবে টানিয়া ফেলিয়াছিলে। তখন তোমাকে আমরা অভিনন্দন করিয়া দেবতার আসনে বসাইয়াছিলাম। তুমি আজ দেবতা হইয়া আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ। আমরা কিন্তু ভুলি নাই যে, তোমাকেও সেইভাবে টানিয়া ফেলিবার ক্ষমতা আমরাই রাখি। দেবতাকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করিবার ক্ষমতা এই মানুষেরই হাতে।

পঞ্চশর রায়, তুমি আমার কেহ নহ। আমার স্থান ওই অখ্যাতনামাদের দলে, যাহারা আমারি মত, যাহাদের শোণিত আমারি মত প্রতিক্রিয়াশীল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তোমার গজদন্তের দুর্গে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। নিদারুণ সুষুপ্তিতে আপন সত্তা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। সহসা আমার উপাস্য দেবতার নরশীলতা আমাকে আত্মদর্শন করাইল। যাহাকে ধ্বংস করিবার আয়োজন তুমি করিতেছ, আমিও তাহারি মত এক অদম্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রকাশ।

পঞ্চশর রায়, আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু আমার আদর্শ আমার ভালবাসারও উর্দ্ধে। তোমাকে ভালবাসিয়া আমি আমার আদর্শ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইতে পারিব না। ভুলিও না আমার প্রতিটি রক্ত-কণিকা সংগ্রামশীল। অসংখ্য জীবাণুর বিরুদ্ধে বার্দ্ধক্যের বিরুদ্ধে তাহারা অহরহ সংগ্রাম করিতেছে। সেইরূপ

অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্থবিরের তারুণ্য নাশের বিরুদ্ধে তাহারা সংগ্রাম করিতেছে। তোমার আকর্ষণ সে সংগ্রাম নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। তাহারা আমার অপেক্ষাও শক্তিমান। সুতরাং, হে পঞ্চশর রায়, আমাকে ক্ষমা কর। আজ হইতে আমিও তোমার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিলাম।

পলায়ন

অলকাদির বাড়ীর সোপানশ্রেণী সর্পিল। আমার ভালো লাগে না। সহসা রাস্তার আলো হইতে নিবিড় অন্ধকারে ডুব দিতে হয় ঐ সিঁড়িতে পা দিলে। আঁকাবাঁকা কর্কস্ক্রু ভঙ্গিতে সেই সব সোপান ঊর্দ্ধমুখে খাড়া উঠিয়াছে।

কিন্তু জটিল অন্ধকারের আবর্ত সহসা শেষ হইয়া যায় এক সময়ে। বন্ধুর পথ বন্ধুর কাছে পৌছাইয়া দেয়। হঠাৎ শেষ সিঁড়িটির শেষ হয় একখণ্ড আলোকোজ্জ্বল বারান্দায়। দুই-একটি ফুলের পাত্র সাজানো, দাঁড়ে পোষা কাকাতুয়া।

সেই বারান্দারই পাশ হইতে অলকাদির ঘরের দ্বার খোলা। দরজায় পরদার বালাই নাই, সোজা প্রবেশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। সেই ছোট একফালি ঘরে সরু তক্তপোষে বিছানা—মোটা খদ্দরে ঢাকা। শয্যাই টেবিলের কাজ করে কারণ লেখাপড়ার কাজে অলকাদির বিস্তর কাগজ-পত্র, বই-খাতার প্রয়োজন হয় তিনি ছোট একখানি কাগজ চালান, বিভিন্ন কমিটির সেক্রেটারী হইতে সদস্যগিরি করেন। তাহার উপর নিজের খরচ সংগ্রহের জন্য স্কুলে শিক্ষা দেন। তাঁহার সমগ্র জীবন রাজনীতিতে উৎসর্গীকৃত। এক পাশে একটি ছোটগোছের টেবিল, তাহার উপরে ঔষধপত্র, এটা ওটা সাজানো। তাহারি ড্রয়ারে কয়েকটি চুলের কাঁটা, একখানি চিরুণী। প্রসাধনে ওই কাঁটা এবং চিরুণী একমাত্র আনুষঙ্গিক। ঘরে

আয়না নাই। চেয়ারে পড়ে সরু তক্তপোষের সমুখে। এই পরিবেশের সঙ্গে ফুলের পট অথবা দাঁড়ের কাকাতুয়ার কোন সামঞ্জস্য নাই। সেগুলি অলকাদির সৌখিন ভ্রাতারা আমদানী করিয়াছেন। পৈত্রিক বাড়ীর এককোণে অলকাদি নিজের অধিকার সঙ্কীর্ণ করিয়া বসবাস করিতেছেন। বোনেরা সকলেই বিবাহিতা। বিধবা মা কন্যাকে সাহায্য ভিন্ন বাধা দেন না। ভ্রাতারা বোনের কাজ-কর্ম্মে সন্তুষ্ট নয়। দেশ অলকাদিকে যতটা প্রাধান্য দেয়, তাঁহারা দেন অনেক কম। মূল কারণ বোধ হয় বাংলার ভাইদের বোনের প্রতি চিরাচরিত সূক্ষ্ম ঈর্ষা। যদি কোন কারণে কোন বোন ভাইদের অপেক্ষা কৃতী হইয়া ওঠে, তাহারা সেই অপরাধ ক্ষমা করিতে পারে না।

অলকাদির বাড়ীতে যাতায়াত ছিল। অনেকদিন তাঁহার সহিত দেখা না করিয়াই চলিয়া আসিতাম। দেখিতাম, দারুণ গ্রীষ্মে খদ্দরের জামা ও কাপড় পরিহিতা অলকাদি অবিচলিতভাবে তক্তপোষের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার মুখ আর্য্যজাতির উপযুক্ত সুগঠিত! বয়সের ছাপ ধরিবার পূর্ব্বেই সারামুখে মৈত্রী ও মানবতার ছায়াচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সৌন্দর্য্য তাঁহার নাই, সৌন্দর্য্যের অধিক কিছু আছে।

নিয়মিত অলকাদির বাড়ীতে ষ্টাডি ক্লাশ বসিত, ছেলে-মেয়েদের রাজনীতিতে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার উদ্দেশে সেই সময় কিছু কিছু অলকাদিকেও বলিতে হইত। অলকাদি ভালো বক্তা ছিলেন না। আমি অবাক হইয়া ভাবিতাম, সামান্য কয়েকটি কথা বলিতে যিনি অস্থির হইয়া পড়েন, অত্যন্ত দুঃসাহসিক কার্য্যকলাপ কেমন করিয়া তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইল? এই নীরব কর্ম্মীর কোথায় ইস্পাত লুকান আছে?

প্রথমে নিছক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেই সব রাজনৈতিক আবর্ত্তের ফেন আস্বাদ করিতে লাগিলাম সুখে। মনে হইত কি এমন একটি বস্তু রাজনীতি, যাহার জন্য এত লোক পৃথিবীর বহু বস্তুই ছাড়িতে পারে? যাহারা একবার প্রবেশ করে তাহারা পুনরায় ফিরিয়া আসে না। নারী কেন প্রেম অপেক্ষা রাজনীতিকে অধিকতর আগ্রহে গ্রহণ করিতেছে? কি আছে ইহার মধ্যে।

মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিতাম, অলকাদি বিশেষ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। যাহার অধরে লিপষ্টিক্, নখরে কিউটেক্স-রাগ, তাহার মনে রাজনৈতিক আগ্রহ। ইহাতে জানি না, তিনি আমাকে অসামান্যা মনে করিতেন কি না।

ক্রমে ক্রমে আমার সখ নেশাতে পরিণত হইতে লাগিল। মনে হয়, আজ ষ্টাডিক্লাশে এই বিষয়টি জানা যাইবে, কাল ষ্টাডিক্লাশে ওই বিষয়ে প্রশ্ন করিব। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাজনৈতিক আনুষঙ্গিকেও যোগ দিতে লাগিলাম। আমার প্রতি অলকাদির একাগ্রদৃষ্টি উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল।

একদিন ষ্টাডিক্লাশের শেষে জলপিপাসা নিবৃত্ত করিয়া সিঁড়ির সর্পিল আবর্ত্তে একা নামিতেছি, হঠাৎ অলকাদি ডাকিলেন, "সুজাতা শোন।"

সর্পিল সিঁড়ির অন্ধকার ছাড়িয়া আলোর দেশে উঠিয়া আসিলাম, "কিছু বলবেন?"

"এস ঘরে।" বিছানার কাগজপত্র সরাইয়া অলকাদি আমাকে বসিতে দিলেন। নিজে চেয়ারে বসিলেন। একটুক্ষণ নীরব থাকিবার পরে আমার প্রতীক্ষ মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সহসা সোজা কথাটিই বলিলেন,—

"তুমি আমাদের দলে যোগ দেবে?" এ প্রশ্ন, না, প্রশ্ন নয়,

অলকাদির কণ্ঠে ইহা আদেশ,—এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সহসা থতমত খাইয়া বোকার মত করিতে লাগিলাম, "আপনার দল ?... অ্যাঁ...আমি ?"

"সুজাতা, তোমার জীবনও কি উদ্দেশবিহীন হবে ? খেয়ে-পড়ে থাকবার চেয়ে বেশী কিছু করবার নেই ?"

নির্ব্বোধের মত কহিলাম, "কি করব ?"

"একটা বড় কাজে জীবনকে চালাও। নইলে দেখবে কিছুদিন বাদে জীবনটা নীরস হয়ে যাবে। যে কোন জীবনই তাই হয়।"

"আপনি কি রাজনীতিতে আমাকে যোগ দিতে বলছেন, অলকাদি ?'

"আমি তোমাকে দেশকে ভালবাসতে বলছি। রাজনীতির মূল কথাই তাই। দেশপ্রেম রাজনীতির চেয়ে বড়।"

দেশপ্রেম ? আহা, কি সুন্দর ! আমি শুধু নিজেকে ভালবাসিব না। আমার প্রেম সর্ব্বব্যাপী হইবে। আমি আমার প্রেমের মহত্ত্বে মহনীয়, আমি বিরাট। অলকাদির ছোট ঘরে আমি আর ধরিতেছি না। নিমেষে আমার মাথা নীলাকাশ স্পর্শ করিল। একটি কথার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন স্বাধীনতা সংগ্রামের চাবিকাঠিটি হাতে পাইলাম।

প্রেম আছে বলিয়াই রাজনীতি নীরস নহে, তাই তাহাতে এত আকর্ষণ। তাই অলকাদি এবং অলকাদির মত অনেকে পুরুষের প্রেম অপেক্ষাও বেশী কিছু পাইয়া পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন। তাই তাঁহাদের মুখে চোখে অপার্থিবতা। আমার অবলম্বনহীন জীবন সহসা ভাল-বাসিবার এত বড় বস্তু পাইয়া পুলকিত হইল। ভালবাসার বস্তু কখনও আমার আদর্শচ্যুত হইবে না, আমাকে ব্যথা দিবে না। সন্দেহের নাই। সহসা চোখের সম্মুখে সহস্র নারীর চিত্র ভাসিয়া উঠিল, যাহারা

পাথরের দেবতার কণ্ঠে বরমাল্য অর্পন করিয়া সারাজীবন দেবতাকে দয়িত ভাবিয়া কালাতিপাত করিয়াছে। দেশপ্রেম উত্তেজনা-সঙ্কুল। দেশকে ভালবাসা আরও সহজ।

সেদিন বাড়ী ফিরিতে পথের অন্য অসংখ্য লোকের সহিত নিজের পার্থক্য খুঁজিয়া দেখিয়া গৌরব লাভ করিলাম। আজ হইতে আমি দেশকে ভালবাসি, তাহারা মানুষকে ভালবাসে। আমি নেহেরু-নাইডুর পর্য্যায়ে। যে দেশপ্রেম তাঁহাদের অন্তরে সূর্য-চন্দ্রের জন্ম দিয়াছে, সেই দেশপ্রেম আমার অন্তরে ভীরু দীপটি জ্বালাইয়া দিল। আজ হইতে আমি সামান্য নহি।

চাঁদার টিনের বাক্স অলকাদির হাতে তুলিয়া দিয়া কহিলাম, "এই নিন। প্রায় একশ' টাকা বাড়ী বাড়ী ঘুরে তুলেছি। দু'চার দিন পরে আবার অন্য পাড়ায় যাব। বই বিক্রি হয়েছে খান ত্রিশ। বাকীগুলো বাড়ীতেই রেখেছি। লোকজন এলে বলে দেখব।"

অলকাদি বলেন, "কাজ তুমি খুবই ভালো করছ, সুজাতা। আচ্ছা, তুমি এখনও কি বিলিতি জিনিষ কেন?"

"হ্যাঁ, কিনি তো।"

"কি কি কেন?"

"এই টয়লেটের জিনিস বেশীর ভাগ। মাঝে মাঝে সুন্দর দেখলে—জামা-কাপড়ও এক-আধখানা।"

"টয়লেট কি পাও না দেশী? সবই তো দেশী আছে। কেন বিলিতি জিনিস কেন, সুজাতা? প্রতিজ্ঞা কর, একটাও বিলিতি কিনবে না।"

আমার চোখের সামনে পুরাতন জগৎ অ্যাণ্ডারসেনের পরীর গল্পে ডাইনির মিঠাই-এর বাড়ীর মত ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

কিউটিকুরার থাম, ম্যাক্স-ফ্যাক্টরের ছাদ। হিমালয়ান বুকের জানালা, ট্যান্‌জির বারান্দা, পণ্ডসের দরজা—ধীরে ধীরে খুলিয়া খসিতে লাগিল।

অলকাদি আমার অভিভূত মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠ শিশুকে ভুলাইবার উপযোগী কোমল ও নমনীয়,—

"সুজাতা, তুমি এখন আমাদের দলে যোগ দিয়েছ। তোমার দলের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। আমাদের আদর্শ বিলাসিতা-বর্জ্জন। তোমার পক্ষে পাউডার ইত্যাদি প্রসাধনের জিনিস একেবারে ছাড়াই ভাল। দেশের কাজে নামলে এসবের সুবিধা থাকেনা। এমন পরিবেশে পড়তে হবে যখন ওসবের সময় অথবা প্রবৃত্তি কিছুই থাকবে না। তাছাড়া সে সব জায়গায় মেলানও যাবে না।"

অলকাদির কথাতে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভূত হইল। যেন কোন অজানা রাজ্যে তিনি আমাকে লইতে চান। আমার পরিচিত আরাম ও আলস্য দূরে থাকিতেছে, একটা সম্পূর্ণ পৃথক পথ তিনি প্রদর্শন করিতে চাহিতেছেন।

দ্বিধায় প্রশ্ন করিলাম, "কি, বনে-জঙ্গলে যেতে হবে নাকি?"

"প্রয়োজন হলে তাও হবে। যে কোন দেশকর্ম্মীকে চরম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।"

"আচ্ছা অলকাদি, আমাকে কেন বেছে নিলেন? আমার মধ্যে কি আছে।"

চকিতে অলকাদির মুখ কোমল হইয়া আসিল, প্রদীপ্তনয়নে

স্নেহের মাধুর্য্য প্রকট হইল। তিনি আমার কাছে সরিয়া মাথায় হাত রাখিলেন,—

"তুমি যে তুমি, তাই।"

"না, সত্যি বলুন। বলতে হবে আপনাকে।"

"সুজাতা, তুমি ব্যুইক্-গাড়ী ও তেতলা প্রাসাদের মোহ কাটিয়ে দেশের কাজে যোগ দিয়েছ। তোমার মুখের রুজ চোখের মাস্কারা বাধা হয়নি। জনস্বার্থে জীবন উৎসর্গ করা তোমার কাছে গান গাওয়ার মতই সহজ মনে হয়েছে। সুজাতা, তোমার মত মেয়েই যে আমাদের দরকার। কিন্তু সুজাতা, সব সময়ে প্রস্তুত থেক।"

আবার অস্বস্তি পীড়া দিতে লাগিল। ঘরের বায়ুস্তর যেন রহস্যে ভারাক্রান্ত হইয়া আমাকে বলিতে লাগিল, "অক্টোপাসের ভুজজালে ক্রমে ক্রমে জড়িত হইতেছ। তুমি কি বুঝিতেছ না?"

অলকাদির কাছে সব সময় নানাধরণের লোক, ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই যাতায়াত করে। কখনও তাহারা চুপি চুপি কথা বলে, কখনও চীৎকার করিয়া তর্ক তোলে। আজও ব্যস্তভাবে দুইজন প্রবেশ করিল। আমাকে দেখিয়া দ্বিধাযুক্ত হইয়া অলকাদির দিকে চাহিল। দুইটি তরুণ যুবক। রাজনৈতিক মহলের আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হই নাই। নির্ব্বোধের মত চেয়ারে বসিয়া রহিলাম। অলকাদি বাহিরে বারান্দায় চলিয়া আসিলেন আস্তে আস্তে কথা চলিতে লাগিল। শুধু কানে আসিল, "ধরা পড়েছে?···সর্ব্বনাশ··· তারপর···যেতে হবে"—ইত্যাদি কয়েকটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা।

অজানা আশঙ্কায় বিচলিত হইতে লাগিলাম। ঘরের কাগজপত্র অপরাহ্নের তপ্তবাতাসে যেন উড়িয়া উড়িয়া বলিতে লাগিল,—

"সুজাতা, সাবধান! এ শুধু দেশপ্রেম নয়। এ প্রেমে রক্ত দিতে হয়। এ প্রেমের পরীক্ষা কঠিন, ত্যাগ গুরুতর।"

বেশ ছিলাম ধনীগৃহের স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের আরামে। কিছুমাত্র দায়িত্ব অথবা দুঃখ-স্বীকারের প্রয়োজন হয় নাই। কেন কিসের মোহে আমি এই সর্পিল সিঁড়ির পাকচক্রে পতিত হইয়া অলকাদির ঘরে আসিয়া পৌঁছিলাম? আলোকজ্জ্বল খোলা ঘর, চতুর্দ্দিক মুক্ত। জানালা দরজায় পরদা নাই। কিন্তু এই ঘরে প্রবেশের পূর্ব্বে ওই সিঁড়ি। বাঁকে-বাঁকে অন্ধকার স্তব্ধ হইয়া আছে। এক ধাপের পরে দ্বিতীয় ধাপের বক্র রহস্য চোখে দেখা যায় না, এমনই বঙ্কিম গতি ওই সিঁড়ির। সেই সোপান-শ্রেণীর রহস্য অলকাদির চতুষ্কোণ বারান্দায় জমা হইয়া আছে। সেখানে অবশ্য ফুলের পট ও কাকাতুয়া আছে। কিন্তু ফুল ও পাখীর গান ওই বারান্দার মর্ম্মবাণী নহে। উহা নিতান্তই অবান্তর।

উত্তেজিত অলকাদি ঘরে প্রবেশ করিলেন। টেবিলের ড্রয়ার হইতে কিছু কাগজপত্র বাহির করিতে করিতে বাহিরে দণ্ডায়মান ছেলেদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খবর দেব কাকে দিয়ে? তোমাদের তো আমার সঙ্গে এখনই যেতে হবে। তবু একজন চলে যাও। এ খবর ওদের পাওয়া দরকার।"

"কিন্তু, ওদের বাড়ী এতক্ষণ পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। আমাদের কারুর ঢোকা সম্ভব হবে না।"

"বাড়ীতে অনেক ফ্ল্যাট। কোন ফ্ল্যাটে যাচ্ছ কে জানবে?"

"আমাদের ওপরে যে ছাপ পড়ে গেছে। দেখলেই চেনা যাবে।"

"তবে কাকে পাঠাই? কার ওপরে ছাপ পড়েনি?"—

অলকাদি আমার দিকে ফিরিলেন সহসা। একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া

রহিলেন, যেন প্রথম আমাকে দেখিতেছেন। এতক্ষণে তাঁহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলাম। দুই গালে যেন তাঁহার কেহ আবির মাখাইয়া দিয়াছে। চোখে অত্যন্ত উগ্র দীপ্তি। নিজের মনে অলকাদি বলিলেন, "ঠিক আছে।" তাহার পরে দুই যুবককে আহ্বান করিলেন, "একে দেখ।"

নিঃসঙ্কোচে তাহারা দরজায় কাছে দাঁড়াইয়া অলকাদির দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলাম। মনে হইল আমার ঠোঁটের লিপ্‌ষ্টিক, হাতের দীর্ঘ রঙ্গীন নখর, চুলের সুবাসিত রুক্ষতা, দেহের মূল্যবান পরিচ্ছদ, সমস্ত কিছুই এত বৃহৎ হইয়া উঠিতেছে যে অলকাদির ক্ষুদ্র ঘরকে ঢাকিয়া তাহারা জগৎ ঢাকিতে অগ্রসর হইতেছে। এতকাল যত দুধ-ঘি, মাখন-সর খাইয়াছি আমার তৈলচিক্কন কোমল দেহ হইতে তাহারা পৃথক হইয়া বাহিরে আসিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে:

"দেখ দেখ। তোমরা ভোজ্যদ্রব্যের কথা চিন্তার অবকাশ পাও না। আর, এই মেয়ে ইহার সাতাশ বছর বয়সে, গ্যালন গ্যালন দুধ-ঘি উদরস্থ করিয়াছে। সকালে মাখন-মিছরি, বিকালে সরভাজাতে এ অভ্যস্ত। তোমাদের দেশে লোক নাকি আবার দুর্ভিক্ষে মারা যায়!"

অপরাধীর গ্লানিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, "যাচ্ছি, অলকাদি।" পলায়ন করিবার প্রবৃত্তি দুর্ব্বার হইয়া উঠিল, ইহাদের সম্মুখে থাকিতে ইচ্ছা হইল না।

অলকাদি আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাদের বলিলেন "দেখ, একে দিয়ে হবে না?"

তাহারা আনন্দের হাসি হাসিল,—"হবে।"

অলকাদি আমার সন্নিকটে সরিয়া আসিলেন, "সুজাতা, আজ তোমাকে একটা কঠিন কাজের ভার দিচ্ছি। শোন মন দিয়ে। এখনই তোমাকে বিডন ষ্ট্রীট চলে যেতে হবে।—নং বাড়ীতে তেতলার ৯নং ফ্ল্যাটে চারটি মেয়ে থাকে। তাদের খবর দিতে হবে।"

"কি খবর?"

"ওরা ধরা পড়েছে। কথা বা'র করবার চেষ্টা হচ্ছে। জিনিসপত্র সরাও।"

"কারা ধরা পড়েছে, কিসের জিনিস?"

"তা জেনে তোমার লাভ নেই।"

"আমি জানতে চাইছি না। সেই মেয়েরা যদি জিজ্ঞাসা করে?"

"তারা কিছু করবে না। তারা সমস্ত জানে। শোন সুজাতা, যেমন তুমি সব সময় হাস, তেমনি হাসিমুখে সহজভাবে চলে যাবে। হয়ত দেখবে পুলিশ বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়ে দুই একবার তাদের দিকে তাকিয়ে মাথা উঁচু করে এমন রাণীর মত ভেতরে চলে যাবে যে, পুলিশ তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাবে না। এ কাজ তোমার দ্বারাই সম্ভব। এখনি রওনা হও।"

"কিন্তু দু'খানা গাড়ীই যে বেরিয়ে গেছে, অলকাদি।"

অলকাদির মুখে হাসির আভাস দেখা দিল, "গাড়ী? গাড়ী দিয়ে কি হবে? দেশসেবিকাকে গাড়ীর অপেক্ষা করলে চলে না। পয়সা নাও। বাড়ীর সামনে যে বাস শ্যামবাজারমুখো যাচ্ছে, উঠে পড় তাতে।"

"আমি বিডন ষ্ট্রীট কোথায় কি করে বুঝব?"

"কণ্ডাক্টরকে বোল, নামিয়ে দেবে। দেরী কর না, সুজাতা। তোমার ওপরে আমাদের অনেক কিছু নির্ভর করছে।"

"ওঃ, কি রোদ বাবা!" পম্মসা রুমালে বাঁধিয়া বারান্দায় আসিয়া বাহিরের রৌদ্রের দিকে চাহিলাম।

অলকাদির মুখ ক্ষণিকের জন্য কঠিন হইয়া উঠিল।' তিনি কি যেন বলিতে যাইয়া থামিয়া গেলেন আবার আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া। তার পরেই ঘরের কোণ হইতে নিজের পুরাতন, সস্তা কাল ছাতাটি আমার হাতে তুলিয়া দিলেন।

গৌরবে অধীর হইয়া প্রখর রৌদ্রে নামিলাম। আমার সহিত দেশের মিল কোথায়? আমার গাড়ী লাগে না। অচেনা ব্যক্তির কাছে অজানা সংবাদের দূত আমি। কঠিন কাজ আমার উপর বিন্যস্ত হইয়াছে। অন্য মেয়েদের ঘর আছে, আমি পথে ফিরিতেছি। আমার বোনেরা খশখশে আবৃত হইয়া সরবতে চুমুক দিতেছে। অলকাদির জরাজীর্ণ খস্তা ছাতা মাথায় একা আমি অভিযানে বাহির হইয়াছি। কি অ্যাডভেঞ্চার! আমি কত বড়!

পুলিশের চক্ষে ধুলি দিয়া বিডন ষ্ট্রীটে তেতলায় মেয়েদের কাছে খবর সরবরাহের পরে অলকাদি আমার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইলেন। এতদিন নিজেদের মূল্য তিনি আমার উপর আরোপ করিতে চাহিতেন, এবার হইতে আমার নিজস্ব মূল্যই তিনি নিজেদের প্রয়োজনের সহিত মিলাইয়া লইতে লাগিলেন।

কয়েকখানি খদ্দর কিনিলাম। কিন্তু অতিসূক্ষ্ম শাড়ীতে যাহার ভার বোধ হয়, সেই অঙ্গে খদ্দর কতদিন চলিবে? বাধ্য হইয়া খদ্দর ত্যাগ করিলাম। চাকচিক্যবিহীন দেশী শাড়ীই ব্যবহার করিতে লাগিলাম। মুখে পাউডার রাখিলেও রুজ, লিপষ্টিক্ বর্জ্জন করিলাম। নখের রং ঘষিয়া তুলিলাম। পরমপ্রিয় রেশমের নেটের ব্লাউজ, মসৃণ জর্জ্জেট

বোনেদের বিলাইয়া দিলাম। ভেলভেটের জুতার পরিবর্ত্তে সাধারণ কাল জুতায় কাজ চালাইতে লাগিলাম। বিশেষভাবে আমাকে লক্ষ্য করিলেও অলকাদি বেশভূষা সম্বন্ধে আর কোনদিন কিছুই বলিলেন না।

পুরাতন বন্ধুরা অবাক হইল,—"ও মা, একি বেশ তোর সুজাতা? ছিঃ, ছিঃ!" নীরবে অনুকম্পার হাসি হাসিতাম। আমি যে দেশ-সেবিকা, স্বাধীন ভারতে আমার অবদান থাকিবে। দেশকে স্বাধীন করিবার ভার যাহারা লইয়াছে, তাহাদের নিকট আমি মূল্যবান। এই বিলাসিতা বর্জ্জন আমার নিকটে একটি অতি বৃহৎ ত্যাগ। আমি স্বেচ্ছায় নবীন বয়সে তপস্বিনী সাজিতেছি। কয়জন পারে?

আর একদিন। সর্পিল সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ফিরিয়া আসিতেছি। অলকাদি বাড়ী ছিলেন না। সিঁড়ির মধ্যপথে দেখা হইল। অলকাদি উঠিয়া আসিতেছেন। আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া অলকাদি ইতস্তত: তাকাইয়া দেখিলেন। কেহ নাই। চাপাস্বরে বলিলেন, "আজ থেকে সপ্তাহে তিনদিন তোমাকে ব্যায়াম শিখিয়ে তৈরী করে নেওয়ার জন্য লোক অপেক্ষা করছেন। লাঠিখেলা, ছোরাচালান শিখতে হবে। আর"—অলকাদি আবার দ্রুত চারিপাশে চাহিলেন,—"রিভলবার ছোঁড়া তোমাকে শেখান হবে।"

সিঁড়ির অন্ধকারে শিহরিয়া উঠিলাম। সর্পিল সিঁড়িতে সর্ব্বদা অনুভূত অজানা আতঙ্ক ঘনীভূত হইয়া বেড়িয়া ধরিল। মনে হইল এক মিনিট বেশী থাকিলে জ্ঞান থাকিবে না। অলকাদির হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম অলকাদির মুষ্টি নারীর কোমল হাতের আলগা বাঁধন নহে; আমার হস্তাপেক্ষা বহু কঠিন দ্রব্য ধরিতে অভ্যস্ত।

অলকাদি আমার হাত পেষণ করিয়া বলিলেন "কি, পালাতে চাচ্ছ? পারবে না?"

সমস্ত সিঁড়ির অন্ধকার আমার স্বীকারোক্তি শুনিতে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিল অলকাদির উজ্জ্বল দুই চোখ।

"হ্যাঁ, পারব।"

অলকাদি আমার হাত ছাড়িয়া দিলেন, সিঁড়ি পার হইয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিলেন। বশীভূত সর্পের বশ্যতায় আমিও অন্ধকারের কুম্ভীপাক হইতে আলোর দেশে আসিয়া বাঁচিলাম।

"অলকাদি, আমাকে এসব শিখতে হবে কেন?"

"এতদিন ধরে শিখেছ সুজাতা, স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিতে হয়। নিজের চোখে দেখেছ। এখন তার চেয়ে কঠিন কাজটা শিখতে হবে।"

গুলী-চালনায় অলকাদির সহকর্ম্মীদের মৃত্যু সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম।

"এখন শিখতে হবে স্বাধীনতার জন্য রক্ত নিতে। এ কাজ আরও শক্ত।" বিমূঢ় শঙ্কায় তোৎলামী করিলাম—"তা, তা,—আ—আ—আমাকে—কি—?—"

"না, তোমাকে এখনই কিছু করতে বলছি না। কিন্তু সুজাতা, সব সময় সব-কিছুর জন্য প্রস্তুত থেক।

সর্পিল সিঁড়ির রসাতলের পথ দিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া ভাবিলাম, "পৃথিবী যদি এত সুন্দর, তবে হিংসা কেন?"

শেষদিন। শীতের অপরাহ্ণে একখানি চিরকুট অলকাদির চাকরের

হাতে পাইলাম, "সুজাতা, এখনই চলে এস। একটি বড় সভায় তোমাকে হিন্দীতে বক্তৃতা করতে হবে।—অলকাদি।"

এই বিগত ছয়মাসে এরূপ আহ্বান অনেক পাইয়াছি। অলকাদি উপস্থিত থাকিলেও অন্য বক্তার প্রয়োজন হইত। কারণ অলকাদি কদাচিৎ নিজে কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমান্বয়ে নানাস্থানে রাজনীতির বিভিন্ন দিক লইয়া যে কোন মুহূর্ত্তে কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিতে আমি এতদিনে অভ্যস্ত হইয়াছি। হিন্দিভাষায়ও কয়েকবার বলিয়াছি।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া অলকাদির গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম বাহিরে আমাদের লইয়া যাইতে সমিতির গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। অলকাদি তাঁহার ঘরে একা নহেন। অন্য একজন বিবাহিতা ভদ্রমহিলা একটি ছোট শিশুর হাত ধরিয়া বিছানায় বসিয়া আছেন। শিশুটির চেহারা মেয়ের মত, পোষাক পুরুষের। সহজে বোঝা যায় না।

অলকাদি সাগ্রহে আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভদ্রমহিলার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন, "এস সুজাতা। ইনি হচ্ছেন অমৃতা গঙ্গোপাধ্যায়। বিয়ের আগে ছিলেন 'রায়'। নিশ্চয়ই বুঝেছ কে?" অলকাদি আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিপদে পড়িলাম। অমৃতা! অনন্য-সাধারণ নাম। কিন্তু, কি সূত্রে যে শুনিয়াছিলাম স্মরণ নাই। ইঁহাকে কেন যেন চেনা লাগিতেছে! এই মূর্ত্তি কবে, কোথায় দেখিয়াছিলাম? এই আকর্ণ-বিশাল নয়ন, গ্রীক নারীর মত নাসিকা ও প্রতিভাব্যঞ্জক ললাট, পদ্ম-পরাগের ন্যায় অধর? বেশভূষা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন সাদাসিধার মধ্যে সৌখিন, ললাটে বৃহৎ সিন্দূরবিন্দু। তাঁহার বেশভূষা ও মুখের পেলব সৌকুমার্য্য দেখিয়া মনে হইল, শুষ্ক রাজনীতির

কাছেপিঠেও ইনি থাকেন না। তাঁহার লাবণ্যময় মধুর ভঙ্গী দেখিয়া স্থির করিলাম: ইনি বোধ হয় কবি হইবেন।

তাই অলকাদির প্রশ্নের ভাসাভাসা উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তা, ইনি বুঝি আমাদের সঙ্গে যাবেন?"

"না। ও আমাব সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। আমরা বেরিয়ে গেলেই বাসে কবে বাড়ী ফিরে যাবে। শ্যামবাজারে থাকে।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "এই সন্ধ্যার মুখে একা যাবেন অত দূরে? এখন তো দিনকাল একেবারেই ভাল নয়।"

অলকাদিব মুখে চোখে সূক্ষ্ম বিদ্রূপের আভা খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "এখন অমৃতার চিন্তা রেখে নিজের চিন্তা কর, সুজাতা। এর আগে যে সব বক্তৃতা করেছ সে সব হয়েছে ছেলেখেলা। আজ প্রকৃত যুদ্ধে নামবে। সভায় কত লোক থাকবে জান? প্রায় দশ হাজার।"

আমি ভীত হইয়া বলিলাম, "আমি পারব না।"

"সে কি, মাইক থাকবে তোমার সামনে। তুমি ছাড়া আমাদের মধ্যে কেউ অনর্গল হিন্দী বলতে পারে না। বেশীর ভাগ লোকই আসবে অবাঙ্গালী। তোমাব বাবার অর্থের সুযোগে তুমি যে শিক্ষা পেয়েছ, আজ দেশের কাজে তাই দরকার। পথে যেতে যেতে পয়েণ্টগুলো তোমাকে বলে দেব।"

"অলকাদি, অন্য কাউকে বলুন। এত লোকেব মধ্যে আমি সত্যিই বলতে পারব না।"

"সুজাতা, আজ আর আমাদের কেউ নেই! যারা বলতে পারত সকলকেই অ্যারেষ্ট হয়েছে। এই রকম দিন আসতে পারে ভেবেই তোমাকে তৈরি করেছিলাম। এ সভায় আমাদের ভরসা একমাত্র তুমি। তোমাকে শক্ত হতে হবে।"

"সবাইকে ধরেছে? কেন, তারা কি করেছিল?"

"নিষিদ্ধ জায়গায় নিষিদ্ধ বক্তৃতা করবার অপরাধে।"

সহসা আতঙ্ক-পীড়িত হইলাম—"অলকাদি, আমি, আমিও কি—" তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিতে করিতে অলকাদি বলিলেন, "হ্যাঁ, আজ তোমাকেও ধরবে। ওদের জানিয়ে দিতে হ'বে দেশের জেলে স্থানাভাব ঘটলেও আমরা অগণিত এখনও। জন-সভায় দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার অধিকার আমাদের ন্যায্য দাবী। একটি সভা ভেঙ্গে দিলেও তখনই অন্য জায়গায় আর একটি সভা করব। আমাদের গলাটিপে ধরলেও আমরা মরবনা।"

অলকাদি আরও কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। আমার কর্ণে কিছুই প্রবেশ করিল না। দেহের কম্পন নিবারণ করিতে বিছানার এক পাশে বসিয়া পড়িলাম। নীরস, যান্ত্রিক কণ্ঠে কহিলাম, "তবে আমাকে জেলে যেতে হবে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বলেছিলাম তো সব সময় প্রস্তুত থেক। রাজনৈতিক কর্ম্মীর ভাবনা-চিন্তা থাকে না, বন্ধুর কাছে বিদায় নেবার অবকাশ থাকে না।"

আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চারিদিকে প্রাচীর, লোহার গারদ। আমাদের বাথরুমের অপেক্ষাও ছোট সেল। আমাদের ঝি-চাকরের অপেক্ষাও কদর্য্য আহার ও শয্যা। সর্ব্বোপরি নিরানন্দ, স্নেহহীন জীবন। সহসা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, "আমি পারব না জেলে যেতে।"

"সুজাতা! তুমি কি বলছ, জান না। আজই তোমার চরম পরীক্ষার প্রথম দিন। আজ পেছোলে চলবে না।"

"আমি সব পারব, জেলে যেতে পারব না। স্বাধীনতা পেতে ব্যক্তিগত পরাধীনতা আমি সহ্য করব না।

কোমল অনুনয়ের স্বরে অলকাদি বলিলেন "ছেলেমী করছ তুমি। আমাদের লোক কোথায়? আজ তুমি ধরা পড়বে। কাল, কিছু বলতে না পারলেও ওই দশ হাজার লোকের সামনে দাঁড়াতে হবে আমাকে। তারপর যেসব ছেলের বাইরে থাকা অবশ্য দরকারী তারাও যাবে।" শেষে—অলকাদি অমৃতার দিকে দেখাইলেন,— "এরা নূতন ঘর বেঁধেছে। সব ভেঙ্গে হয়তো এদেরও আসতে হবে।"

অত্যন্ত রাগ হইল। এই নেহাৎ ভালমানুষ, ঘরোয়া তরুণী! সন্তানের মা, স্বামীর স্ত্রী। বিবাহ বোধ হয় তিন বছরের বেশী হয় নাই। লাবণ্যময়ী, কবিতামূর্ত্তি। অলকাদির হস্তে ইঁহারও নিস্তার নাই!

বিরক্তভাবে বলিলাম, "থাক, ওঁকে আর টানাটানি করে এ পথে নামাবেন না। আমাকেও মুক্তি দিন।"

"একবার এসেছ গোলক-ধাঁধায়, তোমার মুক্তি নেই। জেলে কোন কষ্টই নেই, সুজাতা। আমি তো দশ বছর ছিলাম। পাগলামী ছাড়। আমি কাপড় বদলে আসছি।" অলকাদি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মরিয়া হইয়া কাঁদ কাঁদ সুরে রমণীর প্রতিই রমণীর ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলাম, "আপনি আমাকে ভালবাসেন না! তা'হলে জেলে যেতে বলতে পারতেন না।"

জীবনে প্রথম অলকাদির তীক্ষ্ণদৃষ্টি আবৃত করিয়া সহসা পরমাশ্চর্য্য বিস্ময় ঘটিল। সেই অন্তর্ভেদী, উজ্জ্বল-তীব্র চক্ষে অশ্রুর বন্যা নামিল।

"সুজাতা, তোমাকে বড় ভালবাসি বলেই আজ আমার গর্ব্ব তোমাকে জেলে ঠেলে দিয়ে। সুজাতা, তুমি জান না? যাকে তোমার

চেয়ে, নিজের চেয়েও ভালবাসতাম, তাকে আমি—জেলে নয়—ফাঁসিকাঠে তুলে দিয়েছি। সমস্ত ভালোবাসার ওপরে আমার দেশ।” —অলকাদি চকিতে পাশের ঘরে অদৃশ্য হইলেন।

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কি সাংঘাতিক নারী! তাই—তাঁহার বাহিবের বৈবাগ্য মনেব বৈরাগ্যের ছাপে গৈরিক। ইনি তো সব পাবেন। অশান্ত পদে উঠিয়া সিঁড়িব মুখে দাঁড়াইলাম! সর্পিল সিঁড়ি যেন আহ্বান কবিতে লাগিল ‘এস, এস। আলোব রাজ্যে তুমি কেন? আলোক ছাড়িয়া আমাব বসাতলেব অন্ধকাবে নামিয়া এস। আমার নিশ্চিন্ত, নিশ্ছেদ্য তমসায আত্মসমর্পণ কবিয়া আলস্য-আবামে চোখ বুজিযা কালাতিপাত কব। চক্ষুলজ্জা কেন? সকলেই তাহাই কবে। চলিয়া এস।’

সমস্ত শবীব উন্মুখ হইযা উঠিল সিঁড়িতে পদক্ষেপ করিতে। সর্পিল সিঁড়ি বড রমণীয বোধ হইল। মনে হইল, এই মুহূর্ত্তে ওই সিঁড়ি ধবিযা নামিযা যাওযা অপেক্ষা কাম্যতব আমাব কিছু নাই। কিন্তু, বাবান্দাব ফুলগাছ শাখাব কম্পনে বলিতে লাগিল, ‘না, না, সুজাতা, ভীরুতাব কলঙ্কলিপ্ত হইও না।’

অতিকষ্টে আত্মসম্ববণ করিয়া ঘরে ফিরিলাম। অলকাদির অভাবনীয় রূপ দর্শনে আমাব চোখে অশ্রু আসিলেও অমৃতার মুখের একটিও অপূর্ব্ব সুন্দব রেখাব পরিবর্ত্তন হয নাই। প্রাচীবের ন্যায় বিকারহীন নির্লিপ্ততায় তিনি ঠিক তোমনিভাবেই সন্তানের হাত ধরিয়া বসিযা আছেন। অলকাদিব পবিচিত ব্যক্তিবাও বিচিত্র। সহজে বোঝা যায় না।

অস্বস্তিব সঙ্গে মজ্জমান ব্যক্তিব ব্যাকুলতায় অপরিচিতার কাছেই আবেদন জানাইলাম, “দেখলেন তো অলকাদির কাণ্ডটা? বাড়ীতে

ব'লে আসিনি। এখন বলবার সময়ও অলকাদি দেবেন না। বলতে গেলে ফিরে আসাও সম্ভব হবে না। ওঁরা আমাকে আটকে ফেলবেন। জেলে যাওয়া কি এতই সহজ কাজ?"

অমৃতা কিছু বলিলেন না, শুধু আমার দিকে ফিরিয়া মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনিতে লাগিলেন।

আবার মনে হইল এই আশ্চর্য্য চোখ, এই কমনীয় মুখ কেন আমার এত পরিচিত বোধ হইতেছে? ঠিক! বোধহয় কুমারী-জীবনে ইনি এই অপূর্ব্ব রূপের সহায়তায় বহু অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদিতে নাম করিয়াছিলেন। শিল্পকলাতে যশস্বিনীর উপযুক্ত আকৃতিই বটে। সেই উপলক্ষেই কোন অনুষ্ঠানে দেখিয়াছিলাম।

এতক্ষণে তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতে লাগিলাম "আপনি জানেন না, কত খেটেছি এ কয়মাস। লাঠি-ছোরাখেলা, গুলীছোঁড়া, ফিজিক্যাল কালচার, প্যারেড, চাঁদা তোলা, জিনিস বিক্রি, সমস্ত জায়গায় খবর নিয়ে দৌড়োদৌড়ি। আমার চেহারা, স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। ক্রমাগত যখন-তখন বক্তৃতা করতে করতে গলার এমন দশা হয়েছে যে, গান ছেড়ে দিতে হয়েছে। এতেও অলকাদি খুশী নন, আমাকে জেলে যেতে হবে। আমি তা পারব না। উনি কাপড় পরে ফিরে এলে সোজা বলে দিচ্ছি।"

ভদ্রমহিলা চিন্তিতভাবে আমার দিকে চাহিলেন, এবারেও কিছু বলিলেন না। আমি তাহাতে দমিলাম না। আমার সময় নাই। ওই বুঝি অলকাদির পায়ের শব্দ শোনা যায়। অন্ততঃ একজনকেও আমার মতে দীক্ষিত করিতে হইবে। সুতরাং বলিয়া চলিলাম, "আপনি সংসারী, কোনদিন এ পথে আসেন নি। পুলিশের মার খেয়ে

বিনা বিচারে জেলে পচার কষ্ট কোনদিন আপনাকে ভুগতে হবে না। আমার জেলে যেতে বড় ভয়। আমি পারব না।”

অলকাদি উপযুক্ত বেশে প্রবেশ করিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, “চল, চল, সুজাতা। এক মিনিট দেরী করলে চলবে না। অমৃতা, তুমি বাড়ী যাও। ছোট বাচ্চা রয়েছে সঙ্গে, স্বামীরও ফিরবার সময় হয়েছে। বাইরে যদি থাকতে পারি পরে দেখা হবে।

অমৃতার গলার স্বর এতক্ষণে শোনা গেল। বীণার ঝঙ্কারের মত কোমল, রাগিণীময় স্বর—“চলুন, আমিই যাচ্ছি। খুকুকে আপনার মায়ের কাছে রেখে যাই। ওর বাবা নিয়ে যাবে।”

চমকিয়া উঠিলাম। অলকাদি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “সে কি, তুমি কেন? অমৃতা এখন তোমার পক্ষে ধরা পড়া মারাত্মক। এত তাড়াতাড়ি—”

“তা হোক। আপনাদের যে লোক নেই, খুঁজবার সময়ও নেই। আমিই বলব। উনি বড় ভয় পেয়েছেন।”

অমৃতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মাথা হইতে তাঁহার লাল পাড় শাড়ীর আঁচল খসিয়া হিংস্র বিষধরের উগ্রতায় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ দুলিয়া উঠিল। এতক্ষণে তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিল।

সেই তরবারির মত তনুদেহের দীপ্ত-ভঙ্গি, মুখের আশ্চর্য্য অপার্থিব হাস্য নিমেষে মনে করাইল ইনি কে। অমৃতা রায়, অমৃতা রায়! তের বছর পূর্ব্বে একসময়ে ভারতবর্ষের সমস্ত পত্রিকা ইঁহার চিত্রে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও ক্যামেরার সম্মুখে এই হাসিই ইঁহার মুখে ফুটিয়াছিল। কি নির্ব্বোধ আমি? অমৃতা রায়কে ভুল করিয়াছিলাম?

পনের বৎসর বয়সে এই অপূর্ব্ব সুন্দরী কিশোরী অত্যাচারী বিদেশী

শাসককে নির্ভয়ে গুলী করিয়াছিল প্রকাশ্য রাজপথে। অর্দ্ধেক বয়সে অনন্যসাধারণ রূপ ও গুণকে যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত বধ্যমঞ্চে তুলিয়া দিয়াছিল আমার সম্মুখের এই লাবণ্যময়ী তরুণী। অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বলিয়া ও বিদেশী শাসক বাঁচিয়াছিল বলিয়া ফাঁসির বদলে ভাগ্যক্রমে ইঁহার দ্বীপান্তর হয়। দশ বছর পরে নানা কারণে তিন বছর হইল ইঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

আমি কাহার নিকট আমার জেলভীতি ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে-ছিলাম? কাহাকে আমার দুঃসাধ্য কর্ম্মের, দুরূহ ব্রতের গুরুত্ব বুঝাইতেছিলাম? আমার আশঙ্কা ও ভীতি দিয়া ইঁহাকেই স্পর্শ করিতে চাহিয়াছিলাম?

মুহূর্ত্তে সমস্ত ঘরের আব্‌হাওয়া অসহ্য বোধ হইল। আর থাকিতে পারিলাম না। নিমেষে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া সর্পিল সোপানের অন্ধকারে নামিয়া আসিলাম।

এ পলায়ন ভীরুতায় নহে, আমার ভীরুতা নিদারুণ আঘাতে নিজের মধ্যেই নিজে চিরকালের মত এক মুহূর্ত্তে মরিয়া গিয়াছিল। এ পলায়নের কারণ ভিন্ন। ওই ছোটঘর অমৃতাকে আমাকে দুইজনকে একত্রে ধরিতে পারে না, ওই উপস্থিতির সম্মুখে থাকিবার যোগ্যতা আমার নাই।

কিড্

খট্‌খট্-খটাস্। চাহিয়া দেখিলাম আমাদের পাশের বাড়ীর কিড-সিষ্টার উচ্চহিলের পাদুকার সহিত আদুরে শিশুসুলভ ভঙ্গিমার সামঞ্জস্য রাখিতে না পারিয়া ভূতলশায়িনী হইলেন। কোথা হইতে বা চরাবরা করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিবার মুখে শ্রীমতী এনাক্ষী রায়ের আমারই চক্ষুর সন্মুখে এই দুর্দ্দশা ঘটিল!

একমুহূর্ত্ত। পরমুহূর্ত্তেই 'কিড্' এই আদরের নামধেয়া এনাক্ষী রায় বিনা সাহায্যেই গাত্রোত্থান করিলেন। গ্রীবা বক্র করিয়া আমার দিকে কোপকটাক্ষ হানিলেন, যেন তাঁহার এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী একমাত্র আমি। তারপরে অত্যন্ত ক্রোধের ভঙ্গীতে ঘাড় বাঁকাইয়া জোরে পা ফেলিয়া সম্পন্ন পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। এখনি পাঁচভাই মাতাপিতা তদারকে ছুটিয়া আসিবেন সন্দেহ নাই।

গরদের পাঞ্জাবীতে বাস হইতে নামিবার সময়ে একটি খোঁচা লাগিয়াছিল। বিরক্তভাবে ছোটবোন মল্লিকার শরণাপন্ন হইবার উদ্দেশে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম।

ড্রেসিংটেবিলের সন্মুখে দাঁড়াইয়া মল্লিকা দুই হাতে মুখে কি একটা স্নেহ-পদার্থ মালিশ করিতেছে, চারিপাশে অন্ততঃ তিরিশটা নানা আকারের ও রংয়ের শিশি ও কৌটা।

"কি যে যখন-তখন ঝপ্ করে সাড়া না দিয়ে এসে পড, ছোড়দা!" মল্লিকার বেশবাস কিছু শিথিল ছিল।

চেয়ারে বসিয়া বলিলাম, "নেঃনেঃ। মুখের পেছনে এত সময় আর পয়সা খরচ করিস্ কিন্তু দিনকের দিন তো অবনতিই দেখছি।" মল্লিকা ক্ষেপিয়া উঠিল, "হ্যাঁ খরচ করি আমি! এ সব তো দিদির আর

মিনতির। এই কৌটো দুটো মাত্তর আমার। ভারী একেবারে, হাতে টাকা আমার থাকে কি না! মায়ের মুখে তো সব সময় 'নেই নেই' বুলি লেগেই আছে। হ্যাঁ, খরচ করে বটে ওবাড়ীর কিড। ওর ঘরখানাই দেখবার মত। ঢুকলেই সুগন্ধ পাওয়া যায়।"

আবার কিড! কিডের পতন মনে পড়িয়া উচ্চহাসি রোধ করিতে পারিলাম না। "ওঃ, আজ তোদের কিড যে সার্কাসটাই দেখিয়েছে।"—কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া উঠিল,—"বাড়ী ঢুকবার পথে, হা হা, ধেড়ে খুকু একেবারে, হা হা."—"কি করছ ছোটদা, আস্তে। পাশের বাড়ীতে শোনা যাবে যে"—মল্লিকার চাপা ভৎর্সনায় সজাগ হইয়া চাহিলাম। পাশের বাড়ীর জানালায় কমলারংয়ের নেটের পরদার পাশে একটি ছায়া স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরদা ঈষৎ সরিয়া গেল, একটি কোপকটাক্ষ আমার প্রতি বর্ষিত হইল। পরক্ষণেই কোপকটাক্ষ ভাসিয়া গেল জলে। অনিন্দ্য দুইটি চক্ষু কানায় কানায় জলে ভরিয়া উঠিল, আমার প্রতি একমিনিট সেই অপরূপ চক্ষু দুইটি চাহিয়া রহিল। তারপরে ধীরে ধীরে জানালা বন্ধ হইয়া গেল। মল্লিকা ভীতুস্বরে বলিল, "কি করলে ছোটদা? কিড শুনতে পেয়েছে।"

অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়াছিলাম, মুখে রাগ দেখাইয়া বলিলাম, 'তাই কি করব শুনি? আমি তো ইচ্ছে করে—। তিরিশ বছরের বুড়ো ধাড়ীর সব সময়ে খুকী-খুকী ভাব দেখলে হাসিই পায়।"

"কক্ষনো কিডের বয়স তিরিশ নয়, ওর বড়দাদাই তো ছাত্রিশ। পর পর পাঁচ ভাইয়ের পরে কিড হয়েছে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। তিরিশ না হয়, পঁচিশ তো হয়েছে। এত বয়সে কোন বাঙালী মেয়ের এমন ন্যাকা-ন্যাকা ভাব দেখা যায়না। বিদেশের মেয়েদেরও তো দেখে এলাম, এমনটি আর দেখিনি।"

"কিন্তু ছোটদা, জানো? কিড মেয়েটা বোকা নয়। ওর বাড়ীর লোকেরাই ওকে এমনি কিম্ভূতকিমাকার ভাবে প্রশ্রয় দেয়"—

"যাকগে। কার মেয়ে কে কিম্ভূতকিমাকার করেছে তা দিয়ে আমাদের দরকার কি? এখন এই পাঞ্জাবীটা দেখ তো"—

কিড কিম্ভূতকিমাকার কি অর্থে? বি-এ পাশ করিয়াছে, গান-বাজনা ভাল জানে, দেখিতে সুন্দরী। সম্পন্ন গৃহের আদরিণী কন্যা। সেইখানেই গলদ। অতি আদরে ও যত্নে কিডের মনোবৃত্তি চোদ্দ বছর বয়সে হোঁচট খাইয়া রহিয়াছে। তাহাকে কিড নামে ডাকিয়া পরিজনেরা অত্যন্ত সাবধানতার সহিত পূর্ণযৌবনা তরুণীকে শৈশবের কারাকক্ষে বন্দী করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। ফলে, কিড সত্যই অদ্ভুত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেই তাহার পঞ্চভ্রাতা ও জনকজননীর তৃপ্তি ও গর্ব্ব।

কিডের সুযোগ্য ভ্রাতাদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। কিন্তু, উচ্চশিক্ষা সত্ত্বেও বেকার থাকিবার গ্লানিতে, আহ্বান পাইয়াও কখনও তাহাদের বাড়ীতে যাই নাই। ছয় মাস হইল বিদেশ হইতে নামের আগে-পিছে ডিগ্রী লাগাইয়া আসিয়াছি। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের যুবকদের মত মহিলা সম্পর্কে অসংযত উক্তি আমারও স্বভাব ছিল। কিন্তু, বিদেশী পালিশ এখনও ওঠে নাই। সুতরাং, গ্লানি হইল। অপরিণতহৃদয়া তরুণীর অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুইটি মনে পড়িতে লাগিল ক্রমাগত। কি ছেলেমানুষ! স্থির করিলাম কোন সুযোগে ক্ষমা চাহিয়া আসিব।

সুযোগ মিলিল। দুই চারিদিন পরেই পিতার বৈঠকখানায় কিডের দুইটি ভ্রাতা দর্শন দিলেন। বাড়ীতে কীর্ত্তন গান হইবে, তাই নিমন্ত্রণ।

একটা কাজের সন্ধানে সাহেব সাজিয়া বাটীর বাহির হইতেছিলাম। কিডের ভ্রাতাদের দেখিয়া অন্যদিনের মত পাশ না কাটাইয়া অভিবাদন জানাইলাম। বড় ভাই সাগ্রহে বলিলেন, "ডক্টর মুখার্জ্জি, একবার বিকেল বেলা আসবেন কি? একটু কীর্ত্তনগানের ব্যবস্থা হয়েছে। বাবা আপনাদের খবর দিতে পাঠিয়েছেন। আপনার অবশ্য ভাল লাগবেনা—"

বাধা দিয়া সাড়ম্বরে জানাইলাম, "বলেন কি? আমি কীর্ত্তন বড় ভালবাসি। ফিরে এসে আর শোনাই হয়নি। নিশ্চয় যাব।"

গানের আসরে কিডের দেখা মিলিল না। আমার পিতা প্রশ্ন করিতে কিডের মা উত্তর দিলেন, "আর বলবেন না। ভাইদের সঙ্গে কি নিয়ে একটু বেধেছে, ঘরে দোর দিয়ে বসেছে। উনি গেছেন মেয়ের মান ভাঙাতে। এত বয়স, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে পাকল না। কি যে জ্বালা হয়েছে আমার!" কিড-জননীর মুখে কিন্তু তৃপ্তির ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল, জ্বালার উত্তাপ নহে।

• আমার বাবা বলিলেন "সত্যি, একেবারে ছোট বাচ্চার মত মেয়ের মন রয়ে গেছে আপনার। বিয়ে নিয়ে মুস্কিল হবে, কারণ সবাই তো বুঝবে না—"

কিড-জননী অস্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বলিলেন, "সেই রকম লোক দেখেই দিতে হ'বে। মেয়ে আমার আমাদের কয়টি প্রাণী ছাড়া জানে না। বিয়ের কথা ওর ভাবতেই পারিনে।"

জ্যেষ্ঠ কিড-ভ্রাতা হাসিয়া উঠিল, "কিডের বিয়ে? হায়, হায়!"

বিরহ-ব্যাকুল মাথুর পালার অবসানে কোমল-কাতর চিত্তে বাড়ী ফিরিবার সময়ে রায়বাড়ীর গেটের কাছে কিডের সহিত দেখা হইল। সে বন্ধুকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতেছে। কি বলিয়া ক্ষমা চাহিব চিন্তার

বিষয়, কারণ এক্ষেত্রে শ্রীমতী বয়সে যুবতী হইলেও মনে শিশু। বক্র কটাক্ষে আমার দিকে চাহিয়া কিড পাশ কাটাইয়া যাইতেছিল। মরিয়া হইয়া হাতযোড় করিয়া ঈষৎ ঠাট্টার ভাবে বলিলাম, "মাপ করতে হবে।"

কিডের অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হইয়া উঠিল, আবদেরে শিশুর কণ্ঠে সে বলিল, "থাক, ঢের হয়েছে। জানেন, আপনি এসেছেন বলেই আমি আজ গানের আসরে যাইনি?"

"আমার অপরাধ?"

"আপনি আমার পড়ে যাওয়া নিয়ে মল্লিকার সঙ্গে হাসাহাসি করছিলেন, আমি দেখেছি।"

"কি শোনা গেছে জানতে পারি কি?"

"কথা বেশী শুনিনি, হাসি শুনেছি।"

রক্ষা পাওয়া গেল। কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিলাম, "হাসি ঠিক ওই বিষয়ে নয়। নিজেও যে আছাড় খেয়েছিলাম!"

"সত্যি?"

"ছেঁড়া পাঞ্জাবী মল্লিকা সেলাই করে দিয়েছে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে।"

"ইস্! এ কথা আগে জানলে গানের আসরটা মাটী হোত না। আগে বলেন নি কেন?"

এবার সত্যই হাসাইল কিড। হাসিয়া বলিলাম, "তুমি কি আগে জানতে চেয়েছিলে? তোমাকে 'তুমি'ই বলছি কিন্তু।"

পঞ্চবর্ষীয়ার সারল্য ও সঙ্কোচহীনতায় বিস্ফারিত চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া কিড বলিল, "সকলে তো আমাকে তুমিই বলে!"

তাহার পর হইতে কিডের সহিত আলাপ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল।

মল্লিকা ওই দিন ওই সময়ে আমার পাঞ্জাবী রিপু করিয়াছে জানিয়া কিডের আমার উপর অগাধ বিশ্বাস জন্মিল। ভাগ্যচক্রে মল্লিকা নিজেও পাঞ্জাবী ছেঁড়ার ইতিহাস জানিত না।

কিডের বাড়ী দ্বিতীয় দিন প্রবেশের ঘটনা একটু অদ্ভুত। মধ্যে পথে-ঘাটে দেখা-সাক্ষাৎ ও সামান্য কথাবার্ত্তা হইলেও কিডের এই ধরণের আহ্বানের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বেয়ারার হাতে চিঠি—
"সুবীনদা, এখুনি একবার আসুন—কিড।"

কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নচিত্তে বেয়ারা-পরিচালিত হইয়া কিডের ঘরে প্রবেশ করিলাম। পরিবারের প্রায় সব কয়েকটি প্রাণী সেখানে উপস্থিত। আমাকে দেখিয়া কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিল না,—সাদরে অভ্যর্থনা করিল। সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত আমার ডাক পড়িয়াছে। দর্জ্জি কিডের জন্য একটি মূল্যবান ব্রোকেডের জামা সেলাই করিয়া আনিয়াছে। কিডের মতে তাহার একটি হাত লম্বায় বড়, একটি ছোট হইয়াছে। আমাকে ভাল করিয়া দেখিয়া দিতে হইবে।

হতবুদ্ধি হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "আমাকে কেন? আমি কি বুঝি?" কিড-জননী বাৎসল্যের হাসি হাসিলেন,—"আর বাবা বোলনা। আমি বলছি, ঠিক আছে। তা মেয়ের কি তর্ক। শেষ হাল ছেড়ে আমি বললাম, পাশের বাড়ীর যে কোন লোককে ডাক, বলে দেবে ঠিক আছে। অমনি পাগ্‌লি সত্যি সত্যি ছুটল। এখন তো মেয়েরা সব কলেজ-স্কুলে। তাই তোমাকেই ডেকেছে।"

জামার হাত দুইটি নিজের হাত দিয়া মাপিতে মাপিতে কিড বলিল, "শুধু সেইজন্যে বুঝি? মল্লিকা বলছিল সেদিন, ছোটদা জামাটা নিজে আমাকে দেখিয়ে সেলাই করাল। তাহ'লে তো উনি ভাল সেলাই জানেন।"

মধ্যম কিড-ভ্রাতা হাসিয়া উঠিল,—"দেখছেন তো ডক্টর মুখার্জ্জি, সাধে কি আমরা ওকে কিড-সিষ্টার বলি?"

বালিগঞ্জের আধুনিক পাড়ায় বাড়ী। উভয় পরিবারে পূর্ব্বেই হৃদ্যতা ছিল। এবারে আমিও সেই চক্রে যোগদান করিলাম। কিডের ভ্রাতাদের বিশেষতঃ তৃতীয় জনের সহিত খানিকটা সৌহার্দ্দ্য দেখা দিল। ছোট ছোট নানা ঘটনার মধ্য দিয়া কিড-চরিত্র আমার চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার দিকে কিড এ-বাড়ী আসিয়া আমার হাতে একখানি বই দিয়া বলিল, "সেজদা আপনাকে পাঠিয়েছে।"

বইখানি সযত্নে কাগজ ও দড়ি দিয়া মোড়া, সর্ব্বাঙ্গে গালার শিলমোহর। পাশাপাশি বাড়ীতে এভাবে পার্সেল করিয়া পাঠানোর তাৎপর্য্য বোঝা কঠিন। বিস্মিত হইয়া প্যাকেটটি খুলিলাম। একখানি যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক, কিড-ভ্রাতার কাছে পড়িতে চাহিয়াছিলাম। কিডের চোখে পড়িবে বলিয়া এই সাবধানতা! হাসিব কি কাঁদিব স্থির করা কঠিন হইল। পূর্ণবয়স্কা নারীর শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকায় যে পুস্তকের প্রায়োজনীয়তা, সেই পুস্তকই কিডের হাত হইতে সযত্নে রক্ষা করা হইতেছে!

বইখানি তুলিয়া কিডের হাতে দিলাম, "পড়বে কিড?" কৌতূহলে বইএর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কিড বলিল, "ওমা, এই বুঝি! সেই জন্যে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে পাঠিয়েছে। ভয় হয়েছে যদি আমি খুলে দেখি, তাই গালার ছাপ। আমার যদি এ বই পড়তে এতই ইচ্ছে হবে তাহ'লে আমার বন্ধুদের কাছে থেকেই তো নিতে পারি। তারা তো সবাই পড়েছে এসব বই।"

"তুমি পড়নি?"

"না, আমাকে বাড়ীতে ছুঁতেই দেয়না। দাদারা সব সময়ে আমার ভয়ে বইয়ের আলমারিতে চাবী দিয়ে রাখে। কোন বই পড়তে হ'লে আগে তাদের দেখিয়ে নিতে হয়।"

"পড়বে এ বই? আমি দিচ্ছি। এখানে বসে পড়।"

সচকিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া কিড বলিল, "না, দরকার নেই। আমার ওসব ভাল লাগেনা।"

আর একদিন। বালিগঞ্জ প্লেসে এক পরিচিত বাড়ী হইতে দেখা করিয়া ফিরিতেছিলাম। সহসা অভিমান-মিশ্রিত আবদারের কণ্ঠে—যেমন করিয়া একটি কণ্ঠই ডাকিতে পারে—শুনিলাম, "এই সুধীর-দা, দাঁড়ান।"

দেখিলাম, দ্বিতল বাড়ীর বারান্দা হইতে হাত নাড়িয়া আমাদের কিড আমাকে ডাকিতেছে। তাহার পার্শ্বে সমবয়স্কা অন্য একটি তরুণী। বুঝিলাম কিড বান্ধবী অথবা আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। দরজার কাছে অপেক্ষা করিতে কিড উর্দ্ধশ্বাসে আলু-থালু বেশে নামিয়া আসিল,—"আমি আপনার সঙ্গে বাড়ী ফিরব, চলুন।"

আলাপ হইবার পর হইতে কিড কখনও আমাকে কোন বিষয়ে অনুরোধ করে না—প্রত্যেকটি অনুরোধ তাহার অমোঘ আদেশ। বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার সহিত কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাত হয়ে গেছে। এ সময়ে তোমার বাড়ীর লোকেরা তো তোমাকে একা ছাড়ে না।"

"আমাকে নিতে গাড়ী পাঠাবে। কিন্তু সে এখানে নয়, আমার মামীমার বাড়ী ডোভার লেনে।"

"সে কি?"

"আমাকে তো সেইখানেই পাঠিয়েছিল। গাড়ী নাবিয়ে দিয়ে চলে গেছে, আবার নিতে আসবে। আমার মামীর বাড়ী ভাল লাগল না। আমি বন্ধুর বাড়ী মামীর দারোয়ানকে নিয়ে চলে এলাম। গাড়ী ডোভার লেন থেকে ঘুরে বালিগঞ্জ প্লেসে আসবে। আবার এখানেও না পেয়ে বাড়ী চলে যাবে। কি মজা!"

"ছি, কিড। পেট্রোল পাওয়া যায় না, অথচ গাড়ীটাকে এত ঘোরাবে?"

"বা রে, আমি কি করব?"—কিডের স্বর আনুনাসিক,—"আমাকে জোর করে পাঠায় মামীর কাছে। মামীকে আমার ভাল লাগেনা, ভারি হিংসুটী। কি রকম জানেন—"

তাড়াতাড়ি পরচর্চ্চায় বাধা দিয়া বলিলাম, "কিন্তু আমার সঙ্গে এলে, হাঁটতে হবে। ট্রাম-বাসের ভিড়ে তোমাকে নিয়ে উঠতে পারবনা, ট্যাক্সির পয়সা নেই।"

"অল্‌রাইট। আমি খু-উ-ব হাঁটতে পারি।" অসঙ্কোচে দুইহাতে আমার কোটের আস্তিন চাপিয়া কিড চলিতে লাগিল। মাথার উপর পূর্ণিমার চন্দ্র, পথ নির্জ্জন। কিডের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া দেখিলাম। বেশভূষায় কিড কিন্তু শিশুসুলভ সাদাসিধা নহে। তাহার সযত্ন-অঙ্কিত ভ্রূরেখার মধ্যে কুঙ্কুম-চন্দনের পত্রলেখা, গ্রীবাতে অবলুণ্ঠিত এলোখোঁপায় বেলকুঁড়ির মালা জড়ানো, হাতে লাল কাল রেশমী চুড়ির শিঞ্জন। বাসন্তী অঞ্চলে, আরক্ত অধরের কোণে নারীচিত্তের চিরন্তন ইঙ্গিত লেখা রহিয়াছে, শিশুর সারল্য নহে।

আদরে প্রশ্ন করিলাম, "ভয় করছে না, কিড? দাঙ্গা এখন না থাকলেও রাস্তা কি নির্জ্জন, দেখছ তো?"

"ও সবে আমার ভয় নেই।"

গলার স্বরে আরও আদর ঢালিয়া বলিলাম, "তাহ'লে তোমার ভয়টা কিসে, কিড?"

বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল দুইটি চক্ষু বিদ্যুতের শাণিত প্রাখর্য্যে আমার চোখের উপর ঝলসিয়া উঠিল,—"ভয় আপনাকে।"

সহসা মনে হইল এ কিড অন্য মানুষ, হয়তো এতদিনে তাহার যথার্থ পরিচয় পাইতে যাইতেছি। অজানিতে আমার একটি বাহু কিডকে নিবিড় আলিঙ্গনে কাছে টানিতে উদ্যত হইতেছিল। সর্প-দষ্টের শিহরণে কিডের কাঁধের উপর হইতে সেই হাত টানিয়া লইলাম। তাহার আরক্ত অধরোষ্ঠের স্বাদগ্রহণে ব্যগ্র আমার অধরকে নিষ্ঠুর দংশনে নিবৃত্ত করিলাম। মনে হইল, আমার পার্শ্বের এই নারী নিজের উপর এতটুকু কর্ত্তৃত্ব কখনও হারাইতে পারেনা। গলা পরিষ্কার করিয়া সহজভাবে বলিতে চেষ্টা করিলাম, "তার মানে?"

"কি জানি। আচ্ছা সুবীরদা, দেখুন চাঁদটা যেন একটি থালা। স্রেফ ভাত খাবার থালা। কবিরা চাঁদের সঙ্গে ভাত খাবার থালার উপমা দেয় না কেন? লোকে তো সহজে ধরতে পারে। এমন একখানা ভাত খাবার থালা সবাইকার আছে, নয় কি?"

নিশ্চিন্ত হইলাম। আমারই ভ্রম। কিড কিডই আছে।

বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকা যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহা সত্য। আমার কপালে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। কিড, এই নামে

অভিহিতা, কুমারী এণাক্ষী রায় সম্পূর্ণভাবে আমার মনোহরণ করিয়াছেন। আজ আমার শ্লেষ কৌতুক কিছুই নাই, আছে কেবল প্রেম। সাতাশ বৎসরে পুরুষের প্রথম প্রেম প্রেয়সীর মধ্যে কোন অনুপম গুণের সন্ধান পায় নাই। তাহার রূপ অনন্যসাধারণ নহে। নিজে পশার ও চাকুরীবিহীন বেকার ডাক্তার হইলেও তাহার পিতার অর্থে আমার আসক্তি নাই, আমার জন্য অধিকতর ধনী কুমারীরা লালায়িত। তাহার ওই অদ্ভুত অসাধারণ চরিত্রই আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাহাকে বুঝিনা, তাই অন্ধ আবেগে আরও বেশী ভালবাসি।

কিন্তু, জানাই কি ভাবে? শিশুর কাছে প্রেম-নিবেদন সহজ কার্য্য নহে। কিডের দর্পণের মত রেখা-লেশহীন ললাট, স্বচ্ছ চক্ষুর অসঙ্কোচ চাহনী দেখিয়া কবির কাব্য মনে উদিত হয়—

"আমার কুসুমকোমল হৃদয় সহেনি কখনও রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি সহেনি কখনও ভ্রমর-ভর।"

মনে হয় এ জগতে কোন ব্যক্তিই তাহাকে প্রেমের দায়িত্ব বহনের ভারে বিন্দুমাত্র ক্লিষ্ট করিতে চাহিবে না। তবে সে ফুল যথাকালে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পরিজন তাহাকে কাঁচের বাক্সে লোকস্পর্শের অতীত করিয়া পুষ্পের জীবনে চিরস্থায়ী রাখিতে চান—ফলের পরিণতি তাঁহাদের বা ফুলের নিজেরও কাম্য নহে। তবু মূঢ় ভ্রমর কাঁচে পক্ষ প্রতিহত করিয়া ব্যাকুল হয়।

কয়েকদিন উপর্য্যুপরি কিডের সাক্ষাৎ না পাইয়া কিড-জননীকে প্রশ্ন করিলাম।

"আর বোল না, বাবা। দাঁতের মাড়িতে খোঁচা লেগে দাঁত

মুখ ফুলে উঠেছে ক'দিন হ'লো। ফুলো আছে। এখনও তাই মেয়ে আমার লজ্জায় কারুর সামনে বার হননা। শোবার ঘরে লুকিয়ে থাকেন।"

ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "অসুখ হয়েছে, আমরা জানি না তো, একবার যেয়ে দেখে আসা দরকার আমার। নইলে বাড়ী গেলেই মল্লিকাটা জ্বালিয়ে খাবে। তার বন্ধু কিনা!"

"তা, যাওনা বাবা, তুমি তো ঘরের ছেলে। ডাক্তার হিসেবেও তোমাকে একবার দেখাবার কথা আমি বলেছিলুম। কিন্তু মেয়ে কিছুতেই রাজী হ'ল না। আদিখ্যেতাই বেশী বেশী! তা যাওনা বাবা, ওর ঘর তো চেন তুমি। আমি সঙ্গে গেলেই রাগ করবে মেয়ে। তুমি তো ওর নিজের ভাই বল্লেই হয়! যথার্থ আপন দাদার মত দেখে তোমাকে।"

কথাটা ভাল লাগিল না। কিডের ঘরে প্রবেশ করিলাম সাড়া দিয়া। অতি ক্ষীণ নীল আলো জ্বলিতেছে, খাটের উপর কিড শায়িতা।

"ইস, এ ভূতুড়ে আলো জ্বালিয়ে রেখেছো কেন? দাঁড়াও, বড় আলো জ্বালাই।"

"না, জ্বালাবেন না বলছি।"

"কেন শুনি?"

"আমার মুখচোখ ফুলে রয়েছে না?"—

"তাতে কি হয়েছে? আমি কি তোমার চেহারা দেখতে আসি?"

অতিস্পষ্ট লাস্যজড়িত স্বরে উত্তর শুনিলাম, "তবে কি করতে আসেন?"

এক মিনিট নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। ইহা কিডের কণ্ঠ নয়। তাহার খাটের উপরে বসিলাম, দুই হাতে টানিয়া

তাহাকে বিছানা হইতে তুলিতে তুলিতে বলিলাম, "তুমি জাননা, খ্যাকা?"

"আমি কি জানি! ছাড়ুন"—স্বর আদেশের নহে।

পরমুহূর্ত্তে কিড সম্পূর্ণভাবে আমার বক্ষে নিবদ্ধা হইল! তাহার ঈষৎ শুষ্ক অধরে আমার অধর প্রথম মিলনের ক্ষণে অনুভব করিল শিশুসুলভ আত্মসমর্পণ নহে, যৌবনের আবেগময় প্রতিদান। পরমুহূর্ত্তেই আমার অধরের একাগ্রতা ব্যাহত হইল অস্ফুট আর্ত্তনাদে।

"কি হ'ল? কি হ'ল?"

"দাঁতে লাগে না?"—কিডের স্বর আর প্রেমিকার নয়, শিশুর।

সাদা আলোটা জ্বালাইয়া দিলাম। নিজের মুখের স্ফীতি গোপন করিতে কিড দুইহাতে মুখকে আবরিত করিল।

তাহার মুখ হইতে হাত জোর করিয়া নামাইয়া ধরিয়া ডাকিলাম—

"এণাক্ষী, শোন। তোমার নাম যেমন কিড নয়, তুমিও তেমনি শিশু নও। বাস্তব জগতের দিকে তাকাতে ভয় পেও না। ভালবাসাকে নিতে ভয় পেও না।"

কিড ভীতকণ্ঠে অর্দ্ধ-উচ্চারণ করিল, "ভালবাসা!"

"হ্যাঁ। ভালবাসার চোখে তোমার মুখের ওই বিকৃতি কিছুই নয়। আমি তোমাকে ভালবাসি।"

কিড নিরুত্তর রহিল। আমি বলিতে লাগিলাম, "তোমার বাড়ীর লোকেরা তোমাকে শিশু করে রাখতে চান। তোমার মা-বাবার বয়স হয়েছে, আর সন্তান নেই। সুতরাং একটি শিশু সন্তানের মত তোমাকে মানুষ করে তাঁরা নিজেদের অতৃপ্ত বাৎসল্য-কামনা মেটাতে চান। পাঁচ ভাইয়ের কল্পনা নিষ্পাপ-শিশু-ভগিনীমূর্ত্তি—তারা তোমাকে কিড-সিষ্টার রূপেই চায়। বড় হয়ে তাদের সমকক্ষ একজনের

মত নয়। তুমিও এদের হাতে নিজের সত্তা হারিয়েছ। নিজের ওপর, তোমাকে যে ভালবাসে তার ওপর অবিচার ক'রো না।"

ক্ষণকালের জন্য কিডের চোখে যেন সূক্ষ্ম অথচ মারাত্মক বিদ্রূপের আভা খেলিয়া গেল। আমি স্থির নিশ্চিত হইবার পূর্ব্বেই চোখ নামাইয়া কিড আদুরে ভাবে প্রশ্ন করিল, "বা রে, আমি কি করব?"

"আমাকে বিয়ে করো। তোমার মা-বাবা তোমাকে কাঁচের পুতুলের মত অন্য একটি কাঁচের পুতুলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কাঁচের প্রাসাদে পাঠিয়ে দেবেন। আমি বেকার, রোজগার একশোর মত। তোমাকে বিয়ে করলে আলাদা থাকতে হবে। একশো টাকায় সংসার চালাতে হ'লে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবে তুমি। বুঝবে নিজের হাতে কাজ করায় কত কষ্ট, কত তৃপ্তি। ছোটখাটো আনন্দের মূল্য কত।"

কিড নিজের কিউটেক্স-মার্জ্জিত সুদীর্ঘ নখগুলি নীরবে লক্ষ্য করিতে লাগিল, মনে হইল চিন্তা করিতেছে। তারপর অবুঝের ভঙ্গিতে আধ আধ স্বরে বলিল, "বিয়ে কি করে হবে? আমি কায়স্থ, আপনি ব্রাহ্মণ।" ক্ষণপূর্ব্বের চিন্তিত মুখের সহিত এ স্বরের কোন সামঞ্জস্যই নাই।

আর সহ্য হইল না, তাহার হাতে সবলে ঝাঁকুনির সহিত ধমক দিলাম, "ছেলেমি কোর না।"

পলকে প্রলয়ের মেঘের মত কিডের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষে অশনির বিপৎসূচনা দেখা দিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিড চিরাভ্যস্ত ভঙ্গিতে ফিরিয়া আসিল,—"আঃ, হাত ধরে ঝাঁকাবেন না। আমার হাতে লাগেনা বুঝি? যান, আমি আপনার সঙ্গে কথা

বলবো না।" কিড ঘর হইতে নিমেষে বাহির হইয়া গেল। শূন্য ঘরে নির্ব্বোধের মত আমি বসিয়া রহিলাম একা।

আমার ও কিডের পরিচয়-পরিধিতে অনুরূপ ঘটনার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। বহুবার ভালবাসার জালে জড়াইয়া অগাধ জলের রোহিতকে টানিয়া সাধারণ মানুষের ডাঙ্গায় তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রতিবারই পিচ্ছিল মৎস্য সহজ মসৃণতায় আমার হস্তচ্যুত হইয়া গভীর জলের অবোধ্যতায় ফিরিয়া গিয়াছে।

* * * * *

এ আখ্যায়িকার শেষ জানি আমি। আমার নাম মল্লিকা। আর, আমার নির্ব্বোধ দাদা যাহা জানে না, তাহাও জানি।

আজ আমার ছোটদা অখ্যাত নহে, আজ সে কর্ণেল সুধীর মুখার্জ্জী, সি—আই—ই। আজ অস্ত্র-চিকিৎসায় তাহার সমকক্ষ বাংলাদেশে কেহই নাই। কিন্তু আজও সে অকৃতদার। এণাক্ষী রায়ের আশায় নহে—কারণ বিরাট ধনীগৃহে কার্ত্তিকের মত সুকুমার সুন্দর যুবকের সহিত কিডের বিবাহ হইয়াছে! সে জননীর গৌরবও লাভ করিয়াছে। কিডের মা এখনও আত্মপ্রসন্ন হাস্যে আমাদের সংবাদ দেন, "আমার কিডের একটুও বদল হয়নি। কে বলবে বিয়ে হয়ে ছেলের মা হয়েছে! যেন সেই আদুরে খুকীই রয়ে গেছে। হিংসুকেরা বলে হ্যাকা, যারা চেনে তারা বোঝে কি মেয়ে আমার। সরল শিশু।"

সত্যই দেখিয়াছি কিডের কোনোই পরিবর্ত্তন হয় নাই। যুদ্ধোত্তর জগৎ কত বদলাইয়া গিয়াছে। মানুষের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু, কালের শাসন কিডকে একটুও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

পিরামিডের ধ্বংস আছে, গ্রহতারার বিলুপ্তি আছে, কিডের পরিবর্ত্তন নাই।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, নিপুণ অস্ত্রচিকিৎসক হইয়াও ছোটদা কিডকে সম্পূর্ণ দেখিতে পায় নাই। তাহার কারণ সে প্রেমে অন্ধ। ঘনিষ্ঠ আলাপে আমার নারী-চক্ষে কেবল কিডের প্রকৃত রূপ ধরা পড়িয়াছিল।

অত্যন্ত স্বার্থপরতা লুকাইয়া রাখিতে কিড শিশুসুলভ সারল্যের আবরণে নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি তীক্ষ্ণনখরের মত গোপন করিয়া অপরিণত-হৃদয়া খুকী সাজিয়াছিল। তাহার কিম্ভূতকিমাকার অত্যাশ্চর্য্য ধরণ-ধারণ তাহার নিজেরই আবিষ্কৃত, পরিজনেরা তাহা প্রশ্রয় দিত মাত্র। আহ্লাদে ন্যাকারূপে মাতাপিতা ও ভাইদের চক্ষে ধূলা দিয়া কিড জীবনের সমস্ত গুরুভার দায়িত্ব এড়াইয়া নিজের ইচ্ছামত লঘু জীবনের আনন্দে ভাসিয়া চলিত। তাহার চিররুগ্ণা মাতা শত অসুবিধা সত্ত্বেও সংসারের কোন কর্ত্তব্যের ভার প্রাণে ধরিয়া তাহার স্কন্ধে দিতে পারিতেন না। ভাইদের অসুস্থতায় তাহাকে কেহ ডাকিত না, কারণ সে শিশু, তাহার মন রোগ দেখিয়া খারাপ হইবে। পিতার কষ্টার্জ্জিত অর্থের হিসাব-নিকাশ না রাখিয়া নিজের খেয়ালে জলের মত ব্যয় করা কিডের ছেলেমানুষির অপর লক্ষণ। পসারহীন সদ্য ডাক্তার সুবীর মুখার্জীকে জাতির বাধা অমান্য করিয়া বিবাহের ক্লেশ-স্বীকার কিড করিবে কেন? তখন সে শিশু। জমিদার-গৃহে নব-কার্ত্তিকের আদরিণী বধূত্বের আবাসের জন্য অভিভাবকদের মতবাদ শিরোধার্য্য করিবার সময়ে কিড শিশু। কিন্তু, স্বাস্থ্যবান ও রূপবান যুবকের সহিত প্রেমলীলার বিলাসের সময় সে পরিণত-যৌবনা, রহস্যময়ী নারী। অভাব-অনটন ও বাধার মধ্যে প্রেমকে বরণ করিবার সময়ে কিড কিড। প্রসাধন-নৈপুণ্যে

লীলা-বিভ্রমে পুরুষকে উন্মাদ করিবার সময়ে সে পঞ্চবিংশবর্ষীয়া এণাক্ষী রায়।

ছোটদাকে আমি কিছু বলি না। কারণ, আমি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের সাধারণ মেয়ে, কারুণ্য ও মমতা আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এখনও নিরালা মুহূর্তে দাঁতে পাইপ সুবীর মুখার্জ্জি আকাশের দিকে চাহিয়া উদাস হইয়া যায়। সেই ঔদাস্যের মূলে আছে হৃদয়হীনা কিড। অগাধ অর্থ ও প্রতিপত্তির অধিকারী আজও বিবাহ করে নাই। এই কিশোরসুলভ তরল ভাবপ্রবণতার জন্য সে হাস্যাস্পদ। এই স্থিরবুদ্ধি উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক অতি সাধারণ একটি ন্যাকা মেয়ের নিকট চিরদাসত্ব আজও করিতেছে মনে মনে!

তবে অতিসতর্ক কিডেরও হিসাব-খতিয়ানে কিছু ভুল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সুবীর মুখার্জ্জির এই গৌরবময় বর্ত্তমান সেদিন অতীতে লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল। অখ্যাতনামা, ক্ষীয়মাণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী অপেক্ষা স্বনামধন্য ছোটদাদাকে কিড অবশ্যই প্রাধান্য দিত। কিন্তু সে জানিত না, বুঝিতে পারে নাই। কিম্বা কিড যথার্থই বুঝিয়াছিল। কিডকে পাইলে সেই পরিতৃপ্ত পূর্ণচিত্তে উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্থান লাভ করিত না। তবু, স্মৃতিসুখ হইতে ছোটদাকে বঞ্চিত করিব না। কিডকে দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ছেলেমানুষ রূপেই সে জানিয়া সন্তুষ্ট থাক্—স্বার্থপর আত্মসর্ব্বস্ব নারীরূপে নহে।

* * * *

মল্লিকার ধারণা আমি নির্ব্বোধ। সাতাশ বৎসরের অনভিজ্ঞ ছোটদাদা ও সাঁইত্রিশ বৎসরের বিজ্ঞ কর্ণেল মুখার্জ্জি এক ব্যক্তি নহে। কিডকে তখন না চিনিলে পরে ঠিক চিনিয়াছি। কিডের

স্বার্থপরতার যথার্থ রূপ আমি বুঝিয়াছি। আর বুঝিয়াছি কেন কিডকে ভোলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমার সমস্ত জীবন নিজের খেয়ালে ছিনিমিনি খেলিবে, তুচ্ছ ইচ্ছাপূরণের জন্য অসাধ্যসাধনের নির্দ্দেশ দিবে, এমনি প্রেয়সী নারী আমার অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষিতা ছিল। যাহার মনোহারী স্বার্থপরতা আমার অপরিসীম প্রেমকে বার বার পরীক্ষায় ডাকিবে, যাহার কুটিল বুদ্ধি সহস্রবার আমাকে দিশাহারা করিবে।

নারীর কাছে পুরুষ দুই বস্তু চায়—প্রেমলিপ্সা পূরণ ও পিতৃত্বের অধিকার। কিন্ত আমার এই দুই প্রবৃত্তিই তৃপ্ত করিয়াছিল একা নিজেই। তাহাকে ভালবাসিতাম প্রিয়া রূপে, শিশু রূপে। তাই সে আমার চক্ষে অসামান্যা।

আমি প্রতীক্ষা করিয়া আছি কিডের জন্য নহে। স্বামীর প্রেমে সন্তানের স্নেহে অকলঙ্ক চরিত্রগৌরব থাকুক তাহার। আমি তাহার সুখের ঘর ভাঙিব না। কিন্তু আমি প্রতীক্ষা করিয়া আছি কিডের মতই আর এক নারীর জন্য। স্থানপূরণ অপর কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে।

আমার জীবনে সেই নারী আসুক—যে কিডের মতই হৃদয়ের শেষ বিন্দু ভালবাসা নিঙরাইয়া লইতে জানে।

পরিচয়

সলিল বলিতেছে—

আবার তোমাকে দেখিলাম। ধরিত্রী, তুমি জানোনা আমি অন্তরাল হইতে তোমাকে দেখিতেছিলাম। তোমার ছোট-বোনের বিবাহ, প্রশস্ত মর্ম্মরসোপানে তুমি দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রিতা মহিলাদের অভ্যর্থনা করিতেছিলে। সবুজ পোষাকের সহিত কণ্ঠে, কর্ণে তোমার মরকত।—ঈর্ষ্যার রং কেন শুভদিনে পরিয়াছ? ধরিত্রী, তোমার মুখ মলিন, তুমি শ্রান্ত।

তুমি শ্রান্ত? কেন? বিগতদিনে কখনও তোমাকে ম্লান দেখি নাই। আমার তরল ভাবপ্রবণ কবিতার কারুণ্যও একদিন তোমাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। গিরিনির্ঝরের মুক্তগতিতে হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে ছিল তোমার গতি। লঘু চাপল্য তোমার বিশেসত্ব, চিন্তা কখনও তাহাতে রেখাপাত করে নাই। আজ প্রখর আলোকে বিবাহ-সভায় তোমার মুখ ম্লান কেন? টেনিসনের মত প্রেমিকের ভাষা আমার কণ্ঠে ফিরিয়া আসিল—

"When will the dancers leave her alone?
She is weary of dance and play."

অম্বরের কথা—

তোমার বঙ্কিম অধরে রঞ্জনীর লঘু প্রলেপ, আয়ত নয়নপ্রান্ত ভ্রূ-তূলিকায় দীর্ঘীকৃত। তোমার কপোলে আজ রক্তগোলাপ অনায়াসেই বিকশিত। স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, সৌভাগ্যবতী তুমি, গায়ত্রীর বিবাহে অভ্যাগতদের আদর-আমন্ত্রণ করিতেছ। পাহাড়ীদেশে বিবাহিত জীবন যাপন করিবার ফলে তোমার গৌরবর্ণে শ্বেত-গোলাপ-

দ্যুতি। আজ উগ্র আধুনিকা তুমি। বহুমূল্য আবরণে ও আভরণে তুমি সাজিয়াছ। আনন্দে তুমি উদ্দীপ্তা। তোমাকে চেনা এখন আমারও পক্ষেও. দুষ্কর।

কৃত্রিম, যান্ত্রিক হাস্তে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করিলে,—"হ্যালো, এই যে অম্বর। একেবারে Wedding Guest হয়ে এলে? এসেই কিন্তু মাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছি।"

ধরিত্রী! মুহূর্ত্তের জন্য সানাইয়ের মধুকাকলী, জনকোলাহল আমার নিকট হইতে মিলাইয়া গেল। ফিরিয়া গেলাম লুপ্তপ্রায় অতীতে, বহুদূরে অপসৃত কোন এক ক্ষুদ্র গৃহের অন্ধকার পরিবেষ্টনে। তখন তোমার সীমন্ত সিন্দুরশূন্য ছিল, মন আই-সি-এস্ পতিগর্ব্বে পূর্ণ ছিল না! মনে পড়িয়া গেল স্তিমিত মোমবাতির আলোতে তোমার আত্মবিস্মৃত অপরূপ মুখচ্ছবি। আমাদের সেই 'সিঁয়াসের' ঘরখানি—তুমি তখন 'মিডিয়াম' হইতে প্রায় প্রত্যহ। কম্পমান বাতির আলো অন্ধকার গৃহে অপর-দিকের দেওয়ালে তোমার ছায়া ফেলিয়াছে দীর্ঘ করিয়া। নিস্তব্ধ গৃহে বিজলীপাখার মৃদু শব্দ, তোমার প্রেতগ্রস্ত অঙ্গুলির 'বোর্ডের' উপর অসংলগ্ন বিচরণ। শেষের দিনটি মনে পড়ে? তাহার পরেই তোমার বিবাহ হইয়া গেল।

কি একটি ভাষায় সেদিন তোমার হস্ত হইতে লেখা বাহির হইয়াছিল, মনে আছে? আমাদের বিভিন্ন ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ভাস্কর অবনত হইয়া সাশ্চর্য্যে বলিল, "একি, এ যে ল্যাটিন! Ave Imperator, morituri te salutant! এর মানে হচ্ছে—হে সম্রাট, মৃত্যুপথযাত্রীরা তোমাকে অভিবাদন করছে। কি আশ্চর্য্য!"

তোমার মা অর্দ্ধ-চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু, ধরিত্রী তো ল্যাটিন জানে না!"

সেই অন্ধকার গৃহে, অদেহীজনের উপস্থিতিস্পন্দিত অন্ধকার গৃহে আমাদের কল্পচোখের সম্মুখে একটি ভয়াবহ দৃশ্য যেন অভিনীত হইয়া গেল। রোমের 'আরীনা,' পৈশাচিক-মূর্ত্তি রোমান সম্রাট্ উর্দ্ধাসনে সমাসীন। বনজন্তুসঙ্কুল আরীনার নিরস্ত্র গ্লাডিয়েটর-দল হস্ত উত্থিত করিয়া ভীতিকম্পিত কণ্ঠে বলিতেছে,—"সম্রাট, মৃত্যুপথ-যাত্রীর অভিবাদন গ্রহণ করো।"

তুমি সত্যই লিখিয়াছিলে। ধরিত্রী, আজ তুমি মৃত।

এবার অনিল বলিতেছে—

এত শান্ত কেন? যেন জীবনে বড় কিছু লাভ কবিয়া তাহারই প্রাপ্তিসুখে বিভোর। এই তো তোমার হৃদয়-বল্লভ? শ্যালিকার বিবাহেও যাহার বস্ত্রাগারে স্বদেশী পোষাক পাওয়া যায় না! ও তোমাকে কি দিতে পারিয়াছে, কি দিতে পাবিবে?

ধরিত্রী! ধরিত্রী! আমার সহস্র চুম্বনস্মৃতি কখনও কি তোমার অধরে জ্বালাময় দহন আনে না? আমার ব্যাকুল বাহুবন্ধনের আরামও তুমি আজ ভুলিয়া গিয়াছ? প্রশান্তি তো তোমার রূপ নয়, ধরিত্রী। আমার সামান্য স্পর্শেই উদ্বেল সাগরের মত তুমি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে। সূর্য্যের উত্তাপ ছিল তোমার শোণিতে। আমি ভিন্ন কে তোমাকে শান্তি দিতে পারিল? ভুলিয়া গিয়াছ? ভুলিয়া যাও। আমারও অন্যত্র আশ্রয় মিলিয়াছে।

এখন পৃথ্বীশের কথা—

শুনিলাম তুমি পরিবেষণকারীদের ডাকিয়া বলিতেছ, "ভেট্‌কী মাছটা কম আছে। মেয়েদের দিকে ওটা দেওয়া আপনারা বন্ধ

করুন।” দার্শনিক মন তোমার, বহু আলাপ-আলোচনা আমার সহিত করিয়া যাইতে। সেগুলি মনে রাখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।

সমালোচকের মন তোমার, পৃথিবীর সমস্ত কিছুর পশ্চাতে চাহিয়া অন্বেষণ করিতে ব্যগ্র হইত। কোন বস্তুর সহজ সাধারণ রূপে তোমার তৃপ্তি ছিলনা, যেন চরম রূপটি তোমার কাছ হইতে সকলে লুকাইয়া রাখিয়াছে। তোমাকে তাই একখণ্ড 'The Adventures of the Black Girl in her search for God' উপহাব দিয়াছিলাম। আজ অবশ্যই তোমার মনে নাই।

সেই তুমি ধরিত্রী! একদিন প্রাতঃকালীন চায়ের আসরে আমাকে বলিয়াছিলে, “আচ্ছা পৃথ্বী, নেমন্তন্ন-বাড়ীতে মেয়েদের সঙ্গে লোকে এমন দুর্ব্যবহার করে কেন বলতে পারো? তারা তো বিনা নিমন্ত্রণে যায় না?”

সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “কী ব্যবহারটা শুনি?” খনা-লীলাবতীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গাম্ভীর্য্যে তুমি বলিয়াছিলে,—“দেখনা, কোন পদ কম পড়ে গেলে সকলের আগে মেয়েদের দিকে দেওয়া বন্ধ করে। তাছাড়া, জানি দুই একটা জিনিষ কম করে করা হয় মেয়েদের দেওয়া হবে না বলে। আর দেখ, বসবার জায়গা দেয় মেয়েদের যেখানে সেখানে এ গলির মধ্যে, ও গলিব মধ্যে, ও চৌবাচ্চার পেছনে। অথচ মেয়েদের আগ্রহ নেমন্তন্নে পুরুষদের চেয়ে কত বেশী। ছেলেরা তো কোনমতে এক একটা সাদা জামা-কাপড় পরেই সেরে দেয়। আর মেয়েরা শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, কতকগুলো গয়না, জমকালো শাড়ী প'রে সাজগোজ করে যায়। তারওপর ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে নেমন্তন্নে যাবার সময়ে মেয়েদের কি শাস্তি হয়! তবু, বেচারীরা কত আনন্দ ক'রে যায়। কিন্তু, কি বিশ্রী ব্যবহার পায় ওরা!”

একটু থামিয়া আমার উপর সন্ধানী দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন করিলে, "কেন পৃথ্বী ?"

প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে যেন ঈষৎ বিদ্রূপ-দীপ্তি ও কিঞ্চিৎ স্থাকামী দেখিয়াছিলাম। মনে নাই।

সেই তুমি ধরিত্রী, আজ গৃহিণীপনার গর্ব্বে বিস্ফারিত হইয়া নিজের পূর্ব্ব মতামত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ। আজ বুঝি তোমার জগতে প্রেম-ভালবাসার মত অসার বস্তু কিছু নাই—আছে শুধু টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব ?

ভাস্কর শেষ কথা বলিতেছে—

বিবাহসভায় তোমার দৃষ্টির সহিত আমার দৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য মিলিল। তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ। দেখিলাম তোমার চক্ষে আমার জন্য অসীম করুণা, অনন্ত ভালবাসা। দীর্ঘ বিচ্ছেদ তোমাকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। তুমি প্রস্তরমূর্ত্তি ছিলে, তোমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল তোমার জীবন, বিবাহ করিয়া তুমি সংহত হইয়াছ। হয়তো স্বামীকে ভালবাসিয়া অপরের ভালবাসার মূল্য তুমি বুঝিতে শিখিয়াছ। হয়তো বিবাহ তোমার আত্মার উন্নতি সাধন করিয়াছে।

'হয়তো !' ইহা ভিন্ন আর আমি কি বলিতে পারি ? যে মূর্ত্তি তোমার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম এবং যে মূর্ত্তি তোমার আজ দেখিতেছি, তাহা তোমার স্বকীয় মূর্ত্তি কিনা বলিতে পারিব না। জানি, আজ এখানে অনেকে উপস্থিত আছে, যাহারা তোমাকে ভালবাসিয়াছিল। তাহারা কেহই তোমার প্রকৃত পরিচয় হয়তো পায় নাই। হয়তো এখনও তাহারা যাহা দেখিতেছে তাহা তোমার স্বরূপ নহে।

বিভিন্ন রূপে তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছ। জানি না আমিও তোমার স্বকীয়তার সন্ধান পাইয়াছি কি না। তোমার নিজ মূর্ত্তি কেহই দেখে নাই। কারণ ধরিত্রী, তোমার বা কাহারও নিজমূর্ত্তি একান্তই তাহার নিজস্ব। কেহই তাহা সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না। অন্যের সম্মুখে উন্মোচিত করিয়া তুমি তাহার মূল্য হ্রাস করো নাই। রহস্যময়ী ধরিত্রীর মতই তুমি চিরদিন প্রেমের ধরাছোঁয়ার বাহিরে আছ। সেই তোমার পরিচয়।

রঞ্জনরশ্মি

মৃত্যুর মহান্ মাধুরী সহসা সাধারণকে অসাধারণের পর্য্যায়ে উন্নীত করিল। দক্ষিণাঞ্চলে বিশাল অট্টালিকার গাড়ী-বারান্দার নিম্নে আধুনিক হাল্কা স্প্রিঙের পর্য্যঙ্কে মৃতদেহ রাখা হইয়াছে। প্রত্যুষের রক্তিম আলোক সেই গৃহেরই চূড়ায় প্রতিফলিত, যদিও নীচের লনে এখনও অন্ধকার।

শ্বাপদের মত মৃত্যু সুখের ঘরে হানা দিয়াছে। জমিদার পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী পুরন্দর চৌধুরী সাধারণ শবদেহে পরিণত হইয়া— অগ্নিসাৎ হইবার প্রতীক্ষায় অসহায় দ্রষ্টব্য বস্তুর মত পড়িয়া আছে। যে সমাজের বিরুদ্ধে উন্নাসিক বিদ্রোহে আপন জগতের দায়িত্বহীন আধুনিকত্বের মধ্যে পুরন্দর আশ্রয় লইয়াছিল, এখন সেই সমাজের স্কন্ধারোহণ পূর্ব্বক সেই সমাজেরই অনুকম্পায় পুরন্দরের স্বর্গারোহণপর্ব্ব সমাপ্ত হইবে। বহুমূল্যে রক্ষিত যৌবন, বহুপ্রসাধন-চর্চ্চিত দেহ ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে এখনই—একটু পরে—ক্যাওড়াতলার মহাশ্মশানে। উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ সকলে উদাসী। মাতা ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। পিতা বিহ্বল,—বিবাহিতা ভগিনী ও ভগিনীপতি, খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা শেষ ব্যবস্থা করিতেছে।

দীর্ঘ রোগভোগের চিহ্ন পুরন্দরের সর্ব্বদেহে। স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে যে ভোগীর স্থূলতা ছিল, রোগের শাসনে তাহা অদৃশ্যপ্রায়। তবু অভিজ্ঞ অধর, নিমীলিত সুদীর্ঘ নয়ন, নাসিকার গঠনের আশে-পাশে এখনও পড়া যায়—'এই ব্যক্তি জীবনে সুখ ও আরামকে প্রাধান্য দিয়াছিল।' টাইফয়েড রোগীর বিগত-জ্বর মৃত মুখের পাণ্ডুতার

দিকে চাহিলে সহসা মনে হয়—তাহা হইলে পুরন্দরের বয়স হইয়াছিল? প্রতিদিনের জীবনে তাহাকে তরুণ বলিয়াই বোধ হইত।

পুরন্দর চল্লিশ পাইয়াছিল। কেশমূলে শমনের থাবা না লাগিলেও তাহার অধরপ্রান্তের রেখায়, ললাটের অস্পষ্ট কুঞ্চনে যৌবনসীমায় উপনীত তাহাকে বুঝাইত। অধরোষ্ঠের মোহন বক্র ভঙ্গীতে ঈষৎ নিষ্ঠুরতা, নয়ন-নিমীলনে দৃঢ়তা বুঝাইত, পুরন্দর সুকুমার তরুণ নহে। পুরন্দর অকৃতদার ছিল। পরিজনদের সচেষ্ট অনুরোধেও সে দার-পরিগ্রহ করে নাই। তবে সকলে প্রত্যাশা করিত, আজকালের মধ্যেই পুবন্দর বিবাহ কবিয়া উত্তরাধিকারী-নির্ম্মাণে মনোযোগী হইবে। যাইহোক, নানা কারণে পুরন্দব বিবাহ করে নাই, তবে বহু তরুণী, কিশোরীর সহিত আলাপ ছিল। অবিবাহিত ধনী বিবাহযোগ্য ব্যক্তিকে পাত্রীর মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিতেন। এই ধরণের নিমন্ত্রণ পুরন্দরের প্রতিদিন লাগিয়া থাকিত।

খবর পাইয়া অনেক বন্ধু ও হিতৈষিবর্গ আসিয়াছেন। কেহ বা পুষ্পস্তবক আনিয়াছেন; পুবন্দরের জাগতিক দেহের উপরে ন্যস্ত করিতেছেন সসম্মানে। ধীরে ধীরে নানা বিভিন্ন ব্যক্তিবৃন্দের একটি ভীড় জমিয়া উঠিল। সমাজের সকল স্তর হইতে বন্ধু ও পরিচিতবর্গ আসিয়াছেন।—তাহা হইলে পুরন্দব সত্যই জনপ্রিয় ছিল?

পুরন্দরের ভগিনী শোকেব মধ্যেও অভ্যাগতদের প্রতি এক চোখের দৃষ্টি রাখিয়াছে। স্যর কল্যাণ রায়ের স্ত্রীর স্কন্ধে হাত দিয়া কিছুক্ষণ হায়-হায় করিল; সিনেমা-প্রযোজক নবেন্দু মজুমদারের কাছে অগ্রসর হইয়া ক্রন্দন করিল; জমিদার কুন্তলকৃষ্ণের কন্যার হাত ধরিয়া ভ্রাতার মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করিল। এদিকে ক্রমাগত আলোকচিত্র উঠিতেছে

এবং বিশিষ্ট উপস্থিত ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। ভিতর-বাটীতে চা-কফি বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে।

পুরন্দর যাহাদের টাকা ধার দিয়াছিল, তাহারা এত দুঃখেও ঋণের ভার হ্রাস হইল ভাবিয়া হৃষ্ট হইবার উপক্রম করিয়া আবার মনকে চেষ্টা-কৃত বিষণ্ণতা দিয়া শাসন করিতেছে। যে সকল স্থানে পুরন্দর বিল মিটায় নাই, তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া শোকপ্রকাশ করিয়া যাইতেছে, ভদ্রজনোচিত সময়ের ব্যবধানে বৃদ্ধ পিতার নিকট বিল সহ হাজির হইবে।

যে নারীগণ পুরন্দরের সহিত কোন-না-কোন সময়ে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপস্থিত। দুই-এক জন তাঁহারা বিবাহিতা আছেন।

একজন ছিল, আজ সে নাই—তাহার সম্পর্কে নানা অভিমত লোকের মুখে মনে ফিরিতেছে। কিছুক্ষণের জন্য অন্তত পুরন্দর দেবতা হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর অমরত্ব তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার কোন দোষ থাকিতে পারে না। সকলে আপাতদৃষ্টিতে পুরন্দরের ভক্ত আজ।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে আমাদের লক্ষ্য চারিটি মহিলা। একজন প্রায় পুরন্দরের সমবয়স্কা। শাদা রেশমের জামা ও শাড়ী পরিধানে, সীমন্ত সিন্দুরশূন্য। হাতে একগাছি সাদা মোটা সোনার বালা, গলায় বৃহৎ লকেটসমেত হার, হাতে হীরকাঙ্গুরীয়। পুরন্দরের বাল্যসঙ্গিনী, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জমিদার-পুত্রী, বালবিধবা।

এক পাশে থামের আড়ালে যে দাঁড়াইয়া, সে বিশিষ্ট ধনীর পত্নী। প্রখর সৌন্দর্য্যশালিনী। মদ্যপ স্বামীর অনাদৃতা পত্নীর জীবনে প্রেম আনিয়াছিল পুরন্দর।

পুরন্দরের পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে আধুনিকা তরুণী। মধ্য-বিংশবর্ষীয়া। কণ্ঠশিল্পী সে, প্রতিভা আছে। পিতৃবংশের খ্যাতি আছে। রূপ যতটুকু নাই, ততটুকু বৈশিষ্ট্য আছে। সকলের দৃষ্টি তাহার প্রতি। হয়তো পুরন্দর তাহাকেই বিবাহ করিত! তাহার দৃষ্টি—এক পার্শ্বে বড়লোকের বাড়ীতে যে সঙ্কুচিতা কিশোরী দাঁড়াইয়া আছে—তাহার দিকে। রূপ অনবদ্য, কিশোরীর বয়স অষ্টাদশ। স্কুল-শিক্ষয়িত্রী সে। সমস্ত দৃশ্যটি তাহারা দেখিতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতেছে নিজেদের অন্তর্লোক, দেখিতেছে অতীত। পুরন্দরের সম্পর্কে শেষ কথা তাহারা জানে। পুরন্দর কেমন ছিল? বিভিন্ন সংবাদপত্রে আগামী কল্য বিশিষ্ট নাগরিকের তিরোভাবের সংবাদ প্রকাশিত হইবে। দূরের আত্মীয়-স্বজন আঘাত পাইবেন, বন্ধুরা শোকপ্রকাশ করিবেন। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চ, মধ্যদেহী, গৌরবর্ণ, কুঞ্চিতকেশ —সুপুরুষ ছিল সে। সকালে কফি, বিকালে চা, রাত্রে সুরাপানে অভ্যস্ত ছিল। সৌখিন পোষাক, মার্জ্জিত বাক্যবিন্যাস, মোলায়েম ব্যবহার। লোকে বলিত, তাহার অহমিকা নাই, সে সুবিধাবাদীর যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও সুবিধাবাদী নয়। অর্থসাহায্য বিপন্নকে সে করিত, কখনও কাহাকে প্রতারণা করে নাই। বন্ধুবৎসল ছিল। রসিক, গুণগ্রাহী পুরন্দর চৌধুরী। কিন্তু, এ সমস্ত কথা তো ছবিতে রং-চড়ানো। আসল চিত্রখানি কেমন ছিল? কিছুক্ষণের মধ্যে পুরন্দরের চিহ্ন থাকিবে না। শবযাত্রার আয়োজন প্রস্তুতপ্রায়। তাহার পত্নী নাই, সন্তান রহিল না। কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারে নাই। তাহাকে জনতা মনে রাখিবে কি দিয়া? সুতরাং হিসাব-নিকাশের প্রকৃষ্ট সময় এখনই।

বিলাপের স্বরে বৃহৎ অট্টালিকা মুখরিত। আশ্রিত-আশ্রিতারা

কাঁদিবার এমন সুযোগ পাইবে না। সকলেরই আশা অপুত্রক কর্ত্তার উইলে। ভগিনীপতির বিষাদে হরিষ। তাহার পুত্র আছে। বিষয় তো নাতি পায়।

মাতাকে ডাকা হইতেছে শেষ দেখার জন্য। আর রাখা যায় না। সংকীর্ত্তনের দল, খই, পয়সা প্রস্তুত। জন-সমাগম শোভাযাত্রা করিবে। আর্ত্ত-চীৎকার উঠিতেছে—পুরন্দরকে এখনি শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইবে। আজ পুরন্দর দেবতা। তাহার কোন দোষ-ক্রুটী নাই। তাই তাহাকে অমরত্বের আলোকে দেখা সঙ্গত।

পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় নারীর প্রতি তাহার ব্যবহারে। বহু সংস্কৃতি, বহু শিক্ষার মেকিত্ব সেখানে ধরা পড়ে। অনেক প্রেমে গলদ দেখা যায়, অনেক পুরুষত্বে ফাঁকি। প্রথম শ্রেণীর মন না হইলে নারীর নিকট পুরুষের সামীপ্য নির্দ্দোষ হয় না। আমরা দেখি মৃতকে সেই রঞ্জনরশ্মি-সম্পাতে।

বালবিধবার চোখে অশ্রু। লজ্জা নাই। কারণ সকলেই জানে, সে পুরন্দরের খেলার সাথী। শাদা রেশমের অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া মনে মনে হৈমবতী বলিতেছে—'পুরন্দর, জানি তুমি কথা বলতে না পারলেও আমার কথা শুনতে পারছ। অনেকবার যা বলেছি, আবার শোন তুমি। আমার একমাত্র স্বামী ছিলে তুমি। শৈশবের খেলা-ঘরে তোমার উদ্বোধন, বন্ধু! সগোত্র বলে বিয়ে হল না। চলে গেলাম অন্যের কাছে। সে যাওয়া মন চায়নি। ফাঁকির ঘর খসে গেল। ফিরে এলাম পিতৃগৃহে। কিন্তু ব্যবধান আরো বেশী হল। বিধবা চৌধুরী-বাড়ীর বধূ হতে পারে না। তবু সমস্ত জীবন সূর্য্যমুখীর মত তোমার পথের দিকে ফিরিয়ে রেখেছি। কলকাতায় বাসা বেঁধে তোমার কাছে-কাছে আছি, শিক্ষা-দীক্ষায় তোমার উপযুক্ত হবার চেষ্টা করেছি।

তোমার মন যে আমাকেই সম্পূর্ণ দিয়েছিলে, হে আমার সূর্য্য! তুমি বলেছিলে সেই স্মরণীয় পূর্ণিমার তিথিতে,—'হৈম, আমাকে বাহির-জগতে স্বামীভাবে চেও না তুমি! বাবা বেঁচে থাকতে হবে না তা। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ তোমার, এটাও জেনে রেখো।'

জানি, জানি পুরন্দর। আমার আশায় তুমি সংসার করনি। তোমার জীবনের সত্য আর মুখের কথায় কোন পার্থক্য নেই। তোমার সীমাহীন ভালবাসা প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে আমার কাছে ফিরে আসে, কানে কানে বলে যায়—'আর একটু অপেক্ষা কর হৈম,—আর একটু। বাইরের জগতে তোমাকে মর্য্যাদা আমি দেব। অপেক্ষা করছি শুধু সময়ের আশায। আমি রাজর্ষি। অন্তরে আমার বৈরাগ্য, তপস্বিনি, তোমার জন্যে! তোমার ভালবাসা আমাকে গৈরিকবাস পরিয়েছে। অসংখ্য নারীর মধ্যে বিচরণ করেও পদস্খলন হয়নি আমার, কাউকে তো সহধর্ম্মিণীর মর্য্যাদা দিতে পারিনি।'

পুরন্দর, আমার মত ক'রে কে তোমাকে জানে? আমার মত ক'রে কে তোমাকে দেখছে? বাহিরে ভোগী, অন্তরে উদাসী তুমি। লোকে তোমাকে ঠিক চিনতে পারে না, ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি, তাই আমি জানি, শত প্রলোভন তোমার চার পাশে, কিন্তু হে দেবতা, এক দিনও তোমার বিচ্যুতি ঘটেনি।

হে আমার পাথরের দেবতা! এত নিষ্কলুষ তুমি, এত পবিত্র! আমার সাহচর্য্যেও কখন তুমি চরম দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দাওনি। মনে পড়ে সেই দিন? আমার বাগানে তুমি হঠাৎ এলে। আমি বেদীতে বসে মালা গাঁথছি। শুক্লা চাঁদ মাথার ওপরে! বাড়ীতে কেউ নেই। ক্লান্ত তুমি। তোমার সেবা-যত্ন করলাম। মনে হল সেদিন, আকাশের চাঁদ তুমি নেমে এলে হাতের কাছে। কতদিন অপেক্ষা করেছি, কতদিন

আরও অপেক্ষা করতে হবে, জানি না। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি আমাকে ঠেলে দিতে লাগলো তোমার দিকে—তোমার দিকে পুরন্দর! আমি কেঁপে উঠলাম, বৈধব্য আমার বাইরের, অন্তর তো তোমারি প্রেমে লালে-লাল। তোমার মনে আমার নিরাভরণ জীবন গেরুয়া রং বুলিয়েছে। আমার মনে তোমার প্রেম ফুটিয়েছে রক্তগোলাপ। কি প্রভেদ, না পুরন্দর?

আমার ধৈর্য্য-সংযমের বন্ধন খসে গেল। তোমার কাছে প্রার্থনা করলাম। একটি দিন শুধু জীবন আমার ধন্য করে দিতে। সম্পূর্ণ ভাবে চাইলাম তোমাকে, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে চাইলাম। আমি তো কুমারী নই, পুরন্দর! স্বামী আমাকে অনাঘ্রাতা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন নি। যে বস্তু অন্য পুরুষ ছিনিয়ে নিয়েছে, সে বস্তু কেন তুমি গ্রহণ করবে না? আমার দেহ-দেউল কি অবাঞ্ছিতের পদস্পর্শে আবিল হয়ে থাকবে? অহল্যার পাষাণে, রামচন্দ্র, তুমি পদক্ষেপ করবে না?

বলেছিলাম অনেক কথা। অনেক—অনেক কথা। সেই রাত্রিকে ধরে রাখতে কত চেষ্টা করেছিলাম! যদি জীবনের খেলা সহসা শেষ হয়ে যায়, বাঞ্ছিত, মনে করে রাখবার মত কি কিছু দেবে না? আমার ধর্ম্ম? হিন্দুবিধবার ধর্ম্ম?—আমার ধর্ম্ম তুমি। আমার স্বামী তুমি। যে আমার স্বামী ছিল, সে আমার ওপর বলপ্রয়োগ করেছে। পরপুরুষ সে! আমার ধর্ম্ম সে বলাৎকারীর স্মৃতি-পূজা নয়, প্রকৃত মালিকের পায়ে আত্মদান। নাও আমাকে, পুরন্দর! মৃত্যু যদি অকস্মাৎ আসে, কি হবে? জীবনের চরম ও পরম পাওয়া কি এ পারে ফেলে রেখে যেতে হবে?

নির্লজ্জার আত্মপ্রকাশে একবার অসহায় ভাবে আকাশের দিকে তাকালে তুমি। যেন বল-প্রার্থনা করলে। চাঁদের আলো তোমার দেবদুর্লভ রূপকে অপার্থিবতা দান করলো। এ জগতের ঊর্দ্ধে নিমেষে

চলে গেলে, তোমার স্ফটিক-শুভ্র পবিত্রতায় আমার বাসনা রেখাপাত করতে পারলো না। মাথায় হাত রাখলে তুমি আমার। করুণ সুরে আর্ত্তনাদের মত বলে উঠলে—'হৈম, হৈম! আমাকে দুর্ব্বল ক'রো না তোমাকে আমি যতদিন বাইরে স্বীকার না করতে পারি, ততদিন স্পর্শ দিয়ে ম্লান কোরব না। হৈম, আমার মনের কথা জানো। আমাকে আদর্শবিচ্যুত ক'রো না।'

তোমার পায়ে উদ্ধত মাথা নামিয়ে দিলাম। মুহূর্ত্তে বাসনার বিহ্বলতা কেটে গেল। মন ভরে উঠলো। সেইদিন থেকে তুমি আমার চক্ষে দেবতা। আজ মৃত্যু এসেছে তোমার আমার মাঝে। চরমপ্রাপ্তি তোমার হাতে এবারের মত পাওয়া হোল না, বন্ধু, কিন্তু ক্ষোভ নেই! তুমি আমাকে ভালবেসেও আমাকে মলিন করনি। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেও তুমি তোমার আদর্শ বজায় রেখেছ। বাল্যসঙ্গিনীর প্রেমে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র হয়েও বিবাহ করতে পারনি তুমি। জানি, আমাকেই তুমি বিবাহ করতে সমাজ অমান্য ক'রে। পিতার মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলে তুমি। কিন্তু তার আগে মৃত্যুই যে তোমাকে নিয়ে গেল।

আমার আজন্ম বল্লভ—আমার আবাল্য সুহৃদ! নাও, ধরো আমার চোখের জলের মালা! তোমার মর্ম্মর-শুভ্র, হিম ললাটে ঝরুক আমার চোখের জল। দেখুক—দেখুক সকলে, সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত হলেও শোক-প্রকাশের অধিকার আমার আছে। সে তোমার প্রেমের অধিকার।"

পুষ্পাঞ্জলি সেন বলিতেছে মনে মনে—'এই বিধবাটি কে? এত কাঁদছে কেন? বয়স তো ঢের, কিন্তু চেহারা এখনও ভাল

আছে। কে জানে, পুরন্দরের কোন আত্মীয়া বোধ হয়। ওকে তো কোথাও দেখিনি কোন দিন। বোধ হয় গোঁড়া পরিবারের লোক। পর্দ্দানশীন, ফ্যাশন আছে কিন্তু। ওধারে কুঙ্কুম বোস দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক এসেছে! একখানা দুঃখের গান ধরে না দেয়! ওই গলার জোরেই তো পুরন্দরকে প্রায় বেঁধে ফেলেছিল আর কি। আমার সঙ্গে দেখা না হলে হয়তো ওর ভাগ্যেই পুরন্দর চৌধুরীর পত্নী হওয়া নাচছিলো। এধারে ও মেয়েটি কে? বেশ দেখতে! পুরন্দরের কোন কাজিন নয় তো? এত সুন্দর দেখতে! তবে এমন গরিবানা পোষাক-আষাক কেন? ও, হ্যাঁ, উনি তো নলিনী লাহিড়ী। এই বাড়ীতেই দেখেছি। স্কুলে-পড়ানে হা-ঘরে মেয়ে। পুরন্দরের এক বাই ছিল, যার-তার সঙ্গে মেশা। কিছু ছিল না তো দু'জনের মধ্যে? নইলে নেহাৎ বাজে মাষ্টারনী আজ ধেয়ে এ সার্কেলে এসেছে কেন? আবে ছিঃ, কি ভাবছি! নেহাৎ বাচ্চা মেয়ে একটা, পুরন্দরের মেয়ের বয়সী; তাছাড়া পুরন্দরের কি অন্য দিকে তাকাবার অবকাশ ছিল? আজ ছয় বছর আমাদের আলাপ হয়েছে। তার পরে কত মেয়েই ঘুরলো পুরন্দর চৌধুরীর পেছন-পেছন। কিন্তু কেউ তো আমল পেল না। কি একনিষ্ঠ পুরন্দর; আমি বিবাহিতা, তাই বিয়েই করলো না!

কাল উনি বেশী নেশা করেননি। খবর পাওয়া মাত্র আসতে পারলাম ওঁকে নিয়ে। একা আসাটা ভাল দেখাতো না, অথচ শেষ দেখাও হত না। আমি বাঁচতাম কি ক'রে? উনি জানেন পুরন্দর ওঁর বড় বন্ধু, আমাকে ওঁর সম্বন্ধে ভাল বুদ্ধি দেয়। পুরন্দর আমাকে ভালবাসলো, আমিও তৃপ্ত রইলাম। ওঁর নেশা-করা বা বাড়ী না-আসা নিয়ে কান্না-কাটি, হৈ-চৈ বন্ধ দিলাম। উনি ভাবলেন,

পুরন্দরের পরামর্শে আমার পতিভক্তি উছলে উঠেছে। মহা খুশী হলেন বন্ধুর ওপর। ভাবতে হাসি পায়। ভাবতে হাসি পায়? এই কি আমার হাসির সময়? সত্যি, কি হয়ে গেল, না? ভাবতেও পারিনি সত্যি-সত্যি পুরন্দর মারাই যাবে। এত স্বাস্থ্য যার, এত রূপ যার, এত উৎসাহ যার, সে অকালে মারা যাবে? টাকার অভাব ছিল না, চমৎকার চিকিৎসা হচ্ছিল। ডাক্তারেরা বলেছিলেন, সেরে উঠবে। রোজ প্রায় দেখতে আসতাম। সেরেই তো উঠেছিল। হঠাৎ হার্ট ফেইল করলো।

পুরন্দর আর নেই। ভাবতে অদ্ভুত লাগে। দেড় মাস আগেও ছিল সে। জড়িয়ে ধরে পিষে ফেলছিল আমাকে শোবার ঘরের খাটে। রাত্রি দশটা, উনি তখনও ফেরেননি। সে রাত্রে ফিরলেন না মোটে। বন্ধুর বাড়ী ককটেইল-পার্টিতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলেন। পুরন্দর কি পাগলের মত করেছিল সেদিন! ওই এক দোষ ছিল ওর। সংযম ছিল না একেবারে। সব সময় এক জিনিষ চাই। যাক্, আমার তো স্বামী থেকেও ছিলেন না। পুরন্দরই আমার স্বামী হয়েছিল। সে একমাত্র আমাকেই ভালবাসতো। এত সুন্দরী, বাছা-বাছা মেয়েরা ওকে বিয়ে করতে লেলিয়ে বেড়াতো। ও আমার জন্তে বিয়ে পর্য্যন্ত করেনি। স্পষ্ট বলেছিল আমাকে, 'পুষ্প, এ জীবনে এ পাট হোল না। তোমার আশায় তোমাকে ভালবেসে কাটাবো দিনগুলো।' সত্যি, এত ভালবাসা কি কোন মেয়ে পেয়েছে? আমার কি দুঃখে দিন কাটতো ওর সঙ্গে দেখা হবার আগে! স্বামী ফুর্ত্তি করে বেড়াচ্ছেন। একা বিছানায় ছটফট করছি। মনের কষ্টে কি করতাম কি জানি? পুরন্দর এল এ-সময়ে, ভালবেসে আমাকে ভরে তুললে। সব দিকে। এখন কি করে থাকবো আমি?

আমি দোষ মনে করিনি। যে আমাকে ভালবেসেছে, সে-ই আমার স্বামী। ছয় বছরের বন্ধন, পাঁচ বছরের প্রেম। আমার স্বামীর তো অনেক নারী ছিল। কিন্তু পুরন্দরের জীবনে আমি একা। তাই বোধহয় অত আবেগ ছিল ওর। কিছুতেই যেন তৃপ্তি আসতো না। প্রত্যহ সম্পূর্ণ ভাবে আমাকে গ্রহণ করতো সে। বাধা দিতাম মাঝ-মাঝে, লোক জানাজানি হবে, ভয় দেখাতাম। পুরন্দর হেসে বলতো—'তোমার তো স্বামী আছে, পুষ্প! প্রদোষ তোমার স্বামীর ছেলে। ছবি যে আমার মেয়ে তার প্রমাণ তো নেই। তোমাকে দেখলে স্থির থাকতে পারি না আমি। তোমার রূপ জলন্ত আগুন, আমাকে জ্বালিয়ে মারে। 'অগ্নি-শিখা, এসো—এসো, আনো আলো।' টেনে নিয়ে গেল আবার। বড় জ্বালাতন করতো। তা কি হবে? রক্তমাংসের মানুষ তো পুরন্দর, পাথরের দেবতা নয়! অত ভালবাসা যার, অত হৃদয় যার, সে তো ও-সব চাইবেই।

পুরন্দর চলে গেল। কই, আমার চোখে জল কই? ভাল করে বুঝতে পারছি না, যেন আমার কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল! কে আমাকে ভালবাসবে? আমি কি নিয়ে থাকবো? আমি ছবিকে নিয়ে থাকবো। পুরন্দরের চিহ্ন। আমার, পুরন্দরের প্রেমের প্রতীক। যত বড় হচ্ছে, ওরই মুখে-চোখে খুঁজে পাচ্ছি পুরন্দরকে। পুরন্দর গেলেও আমার তো ছবি আছে!'

·

নলিনী লাহিড়ীর মনের কথা—'কেন এলাম? কেন এলাম এখানে এই সমস্ত হৃদয়হীন বড়-লোকের মধ্যে! আমার পুরন্দর নেই, শেষ দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। মনে হচ্ছে এখনি চীৎকার করে কেঁদে উঠবো। এদের সব লোক-দেখানো

শোক। উনি ঠিক বলতেন—'নলিনী, আমার সমাজের লোকদের হৃদয় নেই। তাই ছুটে-ছুটে আমি আসি তোমার কাছে। মনে হয়, তুমি বুঝি অন্য রকম। আমার জন্যেই আমাকে ভালবাসো তুমি। আমার টাকার জন্যে নয়, নামের জন্যে নয়।'

এত বড় পুরন্দর চৌধুরী! অতি গরীব ঘরের মেয়ে আমি, স্কুলে মেয়ে পড়িয়ে খাই। আমাকে পথের ধুলো থেকে বুকে তুলে নিলেন। চাঁদা চাইতে এসেছিলাম। কলকাতার বাছা বাছা বড়লোকের তালিকায় স্কুল থেকে জমিদার পুরন্দর চৌধুরীর নাম দিয়েছিল। বাড়ী দেখে, ঐশ্বর্য্য দেখে স্তম্ভিত হলাম। মানুষ দেখে মুগ্ধ হ'লাম। নিজে আলাপ করে নিলেন। আমাকে বললেন কিছুদিন পরে,—'তোমার বয়স আঠারো, আমার চল্লিশ। কিন্তু মনে হয়, তোমার অখণ্ড অধিকার আছে আমার ওপরে। একমাত্র তুমি এ ছন্নছাড়া জীবনের মালিক হতে পারো।'

বিশ্বাস করতে পারিনি নিজের সৌভাগ্যকে। পুরন্দর চৌধুরীর নামে আধুনিক সমাজ ব্যাকুল, আধুনিক মেয়েরা তাঁকে বিবাহ করতে পারলে ধন্য হয়ে যায়। আমার মত লোকের সঙ্গে ওঁর আলাপ কল্পনাতীত। তাতে, উনি আমাকে ভালবাসলেন এবং একমাত্র আমাকে। কত কথা বলতেন মন খুলে! বলতেন জীবনের সমস্ত গোপন অধ্যায়, যা কাউকে বলেননি। বলতেন আমাকে তিনি আসল অস্তিত্বের কথা তাঁর—যা কেউ জানে না। এই যে সমস্ত বড়ঘরের ফ্যাশানী মেয়েরা, যারা তাঁকে গ্রাস করে ফেলতে ব্যগ্র হয়েছিল, তাদের কাউকে তিনি ভালবাসেননি। এদের আমি চিনি। এঁরা আমাকে অবজ্ঞা করে, জানে না, এদের কত ঘৃণা করতেন তিনি। এদের অক্টোপাশ-জাল এড়িয়ে আমার গলি-রাস্তার একতালা ঘরে

ছুটে যেতেন। ওই যে বিধবা, বুড়ো বয়সেও ওর পুরন্দরের মোহ যায়নি। ওর পায়ে-ধরাধরি থেকে মুক্তি পেতে কষ্ট হ'ত তাঁর। তবু যাকে ভালবাসেন না, তাকে স্পর্শ করেননি। এত টাকা ওই বুড়ীর! কিন্তু প্রবৃত্তি কি!

এই যে পুষ্পাঞ্জলি সেন। ছি ছি! স্বামী থাকতেও কি লালসা! পুরন্দরকে চাই ওর। পুরন্দর প্রত্যাখ্যান করেছেন ওকে, তবু ছাড়েনি। অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী, বিশেষত বন্ধুর স্ত্রী। পুরন্দর তাই দশ হাত দূরে সরে ধর্ম রেখেছিলেন।

গায়িকা কুঙ্কুম বোস আমার দিকে চেয়ে আছে, যেন বুকে ছুরী বিঁধিয়ে দেবে। চাউনি যেন ওর ছুরী। কি ধার, বাবাঃ! উনি এ জন্যে দেখতে পারতেন না ওকে। সকলে বলতো, ওকেই উনি শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করবেন। অত নাম ওর, অত নাম ওর পরিবারের। যে ধারালো মেয়ে, গেঁথে তুলে ক্ষ্যান্ত হবে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বলেছিলেন—'ভুল খবর, নলিনী। কুঙ্কুম আমাকে চায় না, চায় আমার টাকা, আমার বাড়ী, আমার গাড়ী। আমার স্ত্রী হিসাবে সমাজে পরিচয়টুকু চায় মাত্র। ও তো আমাকে ভালবাসে না। ওরা সকলে শক্ত, কঠিন। এই কঠিন পথে একগোছা কিশলয়ের মত তুমি এলে। ভাল তোমাকেই বাসি, বিয়ে করলে তোমাকেই করবো। কিন্তু, জানো তো আমার মা বেঁচে। একমাত্র ছেলে আমি। তোমাকে যদি অসবর্ণ বিয়ে করি, তিনি আত্মহত্যা করে মরে যাবেন। অপেক্ষা করতে হবে, নলিনী। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন, অজস্র চুম্বনের পরে সহসা ছেড়ে দিতেন, বলতেন 'না; আমার যত কষ্টই হোক, তোমার ক্ষতি করতে পারবো না। তুমি কিছু জানো না, নলিনী। তোমাকে অন্যায়ের পথে টানবো না।'

কপালে কষ্টের রেখা ফুটে উঠতো, হাত মুষ্টিবদ্ধ করতেন, তবু সংযমের অবধি ছিল না। আমার চোখে তিনি স্থান পেতেন মহাভারতের বীরকুলের মধ্যে। অত বড় ছিলেন, আমার চেয়ে। কিন্তু, রোমাঞ্চ জাগাতো তাঁর সাহচর্য্যে। অত ধনী—অত মানী! জীবন সম্বন্ধে 'অত অভিজ্ঞতা! সমস্ত আমারি পায়ে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। আমার মত সামান্যার জন্যে অসামান্য পুরন্দর ব্যগ্র হয়েছিলেন, আমার কাছে ধরা দিয়েছিলেন—প্রেমে। এই তো আমার সান্ত্বনা। পুরন্দর না থাকলেও এ স্মৃতি তো কেউ নিতে পারবে না। কিন্তু আর থাকতে পারবো না। উনি নেই! আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন, না। এই নকল শোকের দৃশ্য আর তো সহ্য করতে পারছি না। কেঁদে ফেললাম বুঝি! হৃদয়হীনা কুঙ্কুম বোস কেন আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছে?'

কুঙ্কুম বোসের মনের কথা—সে মনে মনে বলিতেছে :—'নলিনী বুঝি কেঁদেই ফেলে। তা-তো হবেই। ভেবেছিল এত বড় ধনী ব্যক্তির গৃহিণীত্ব তার অবশ্যম্ভাবী। শোক তো লাগবেই।

পুষ্পাঞ্জলি সেনের ভাব ইংরাজী ভাষার মার্জ্জারের মত প্রীত, যে মার্জ্জার ক্যানারী পাখীটি গলাধঃকরণ করে আত্মতৃপ্তিতে ফুলে উঠেছিল। পুষ্পাঞ্জলি ভাবছে, সে-ই একমাত্র পুরন্দরকে পেয়েছিল,—পুরন্দরের স্মৃতিচিহ্ন তার কাছেই আছে। ছবির মুখের দিকে তাকানো মাত্র আমি বুঝেছিলাম। পুরন্দরের স্বীকারোক্তির প্রয়োজন ছিল না।

এধারে হৈমবতী প্রকাশ্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করছে। বাল্য বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে দেখাচ্ছে ও ভালবাসা। বঞ্চিত জীবনে পুরন্দর ভিন্ন কি-ই বা ছিল?

আরও অনেক মহিলা; কেউ এখানে এসেছেন, অনেকে আসেন নি। তাঁরা প্রেম করেছেন পুরন্দরের সঙ্গে। সকলে ভেবেছেন তিনিই একমাত্র প্রেয়সী।

আমি? হ্যাঁ, আমিও তার সঙ্গে প্রেম করেছি। আজ এইক্ষণে সত্যের সন্ধানী রশ্মিতে দাঁড়াব। সকলে ভেবেছিল আমার সঙ্গে পুরন্দরের বিবাহ হবে। এখনও এরা তাই ভাবছে। ভাবছে, জীবনের এত-বড় পুরস্কারটি আমার হস্তচ্যুত হয়ে মৃত্যুর গহ্বরে ডুবে গেল। ভাবছে আমি কি হতভাগ্য! আজ সত্যের মুখোমুখী দাঁড়াব আমি। মৃত্যুর মুখোমুখী পুরন্দর। পুরন্দর অনেক সত্যের সন্ধান জানে না, এরা পুরন্দরের সম্বন্ধে শেষ কথা জানে না। পুরন্দর আমার বিষয়ে সত্য জানে না। শুধু অজ্ঞানতার মধ্যেই এতগুলো জীবন ভুলের মালা গেঁথে কাটালো। এরা কেউ পুন্দরকে ভালবাসেনি। কখনো কোন মেয়ে হৃদয়হীন, নির্ম্মম পুরন্দরকে প্রকৃত প্রেম দিতে পারেনি। তারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে সুন্দরের পূজা করেছে মাত্র। হৈমবতীর কাছে পুরন্দর ধর্ম্ম। শিশুকাল থেকে দেবতার পূজার বদলে পুরন্দরকেই পূজা করেছে ও। দোষ-গুণের মানুষকে সে চেনেনি। চিনলে ভয় পেত। পুষ্পাঞ্জলির যৌবন-কামনা মিটিয়েছিল পুরন্দর। ততটুকু মূল্য পুরন্দর পেয়েছিল। কামনার জলের রং-এ শ্রদ্ধার সোনালী পাড় বসেনি। নলিনী, ঐশ্বর্য্য-অর্থ, যা চোখে দেখেনি, চেয়েও পায়নি, তারই আশায় জমিদার পুরন্দর চৌধুরীর সাহচর্য্যে গর্ব্ব বোধ করতো। এখনও ভালবাসতে শেখেনি ও। আরও যারা— কেউ অর্থের বিনিময়ে, কেউ আনন্দের বিনিময়ে, কেউ মোহের বিনিময়ে পুরন্দরকে প্রেম দান করেছে। পুরন্দরকে কেউ ভালবাসেনি। অনীতাও নয়!

পুরন্দরও এদের কাউকে ভালবাসেনি। নিঃসন্তান হৈমবতীকে স্তোক দিয়ে রাখতো সে ভবিষ্যতের আশা জাগিয়ে। হৈমবতী বিগত-যৌবনা। পুরন্দরের সমবয়স্কা, তার বয়স জানে পুরন্দর। নিজে প্রৌঢ়ত্বে পা দিলেও প্রৌঢ়ার হিসাব পুরন্দরের খাতায় টোকা হয় না। হৈমবতীর প্রেম-নিবেদন পুরন্দরের প্রমাদ ছিল। চিরদিনের কুশাগ্র-বুদ্ধি তবু পরিস্থিতি বজায় রাখতে পেরেছিল। পুরন্দরের অনেক আশা ছিল—হৈমবতীর মৃত্যুর পর তার বিস্তীর্ণ সম্পত্তি একমাত্র পুরন্দর পাবে। সে কথা জানতো পুরন্দর। তবে মৃত্যু যে আগে পুরন্দরকেই নিতে পারে, এ কথা ভেবে দেখেনি সে।

পুষ্পাঞ্জলির অনন্যসাধারণ রূপ-যৌবনে দৈহিক প্রয়োজন ছিল পুরন্দরের। অর্থের বিনিময়ে যে প্রেম, তাতে বিপদের আশঙ্কা থাকে। বহু-বল্লভার প্রেম সে সব প্রেম। জৈব প্রয়োজনে অকৃতদার পুরন্দরের প্রয়োজন মিটতো পুষ্পাঞ্জলির কাছে। তাই তার সঙ্গেও অভিনয় করতে হ'ত। নলিনী ছিল নূতন অভিজ্ঞতা, অনাঘ্রাতা কিশোরী। পুরন্দরের ঐশ্বর্য্যে তার লুব্ধ-বিস্ময়। তাকে যা বলা যেত তাই বিশ্বাস করতো। অনভিজ্ঞা বালিকার চোখে বীর-পুরুষ বা 'হিরো' সাজবার লোভ ছাড়া যায় না। উচ্চে থেকে নিম্নের পূজা-গ্রহণ ভাল লাগে বই কি! তাই তাকেও প্রেম জানিয়ে হাতে রাখতে হ'ত। তবে তার ক্ষেত্রে সাবধান হতে হ'ত। নির্বোধ কুমারী সে। বাধ্য-বাধকতায় না পড়তে হয়। আরও যারা, তারাও দৈহিক প্রয়োজন, ব্যবহারিক সুবিধা ও খেয়ালের তাগিদে ব্যবহৃত হয়েছে। কাউকে ভালবাসেনি পুরন্দর। আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ভালবাসেনি পুরন্দর, সে কথা আমি জানি। তবু কেন আত্মদান করেছিলাম? তাই কি সে বিবাহ-ছাড়া পেল বলে বিবাহ-প্রস্তাব

করেনি? না। আমি পুরন্দরের বন্ধু ছিলাম। মাঝে মাঝে সে আমার কাছে স্বীকারোক্তি করে ফেলতো। আমার গানে মুগ্ধ হয়ে এসেছিল সে, আমার আভিজাত্যে আকৃষ্ট হয়েছিল। আবার চলে গেল! আবার ফিরে এলো। বারে বারে যাতায়াত করতো সে। আমি দ্বার খুলে রাখতাম আশায়। কিন্তু চিনেছিলাম তাকে। তবে আমিও তো প্রথমে এদের মত নির্ব্বোধ ছিলাম। মোহিত হয়েছিলাম পুরন্দরের নিখুঁত অভিনয়ে! হৃদয়হীনের হৃদয়ের সন্ধান পেতাম, প্রেমশূন্য মনের প্রেম দেখে ধন্য হ'তাম। ইতরকে প্রথম শ্রেণীর সংস্কৃতি-সম্পন্নের মর্য্যাদা দিতাম। চলে গেল সে কিছু দিন পরে, আর আসতো না। পুরনো হয়ে গেলাম কিনা! তবু দুঃখের মধ্যে ছিল আমার গৌরব। অসামান্য সে, সামান্যের প্রেমে কি তাকে বন্ধন দেওয়া চলে? আবার সহসা একদিনে ফিরে এল, আগের মত আদর-সোহাগে প্লাবিত করে দিল। নিমেষে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলাম। অত্যন্ত আগ্রহে কাছে বসে তাকে লক্ষ্য করে যেতে লাগলাম। আমার কপোলের চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে সে বলে উঠলো—'আচ্ছা, উনি তো খুব আসেন এখানে, না? একটা সভায় তোমার গানের যা প্রশংসা করছিলেন! মনে হলো, তোমার প্রেমে পড়েছেন উনি।'—'উনি'-নামধেয় ব্যক্তি তখন বাংলা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। সংবাদপত্র খুললেই প্রত্যহ নাম দেখা যায়। আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন।

প্রেম তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত করে দেয় শুনেছি। সাধারণ দৃষ্টির অতীত গুণ-সম্পদ প্রেমাস্পদের ধরা পড়ে প্রেমিকের সেই তৃতীয় নয়নে। সহসা আমার তৃতীয় নয়ন খুলে গেল—এত দিন গুণ-মুগ্ধ তো ছিলাম, আজ বিদ্যুতের আলোকে তোমার দোষ দেখলাম, দেখলাম তোমার

দীন সত্তাকে। তুমি এসেছ পুরন্দর, আমার টানে নয়। 'Man of moment' আমাকে ভালবাসেন বলে। তুমি কৌতূহলী হয়েছ। হয়তো আমার মধ্যে দুর্লভ কিছু আছে, যা দেখে তোমার অপেক্ষা অনেক বরেণ্য ব্যক্তি এসেছেন। তুমি চলে যেয়ে ঠকে গেছ বোধ হয়। আমার সেই দুর্লভতা ধরতে পারোনি তুমি, তাই এসেছ খুঁজে দেখতে। আমার কোন মূল্য তুমি দিতে পারোনি। অন্থের মনোযোগেই আমার মূল্য। কি করে আমাকে মূল্য দেবে তুমি? তোমার নিজের যে কোন মূল্যই নেই। তুমি তো হীরা নও, কাচখণ্ড। মণি কি করে তুমি পরীক্ষা করবে? পুরন্দর, মৃত্যু তোমাকে অমরত্বের রাজ্যে নিলেও মহিমা দিতে পারেনি। তোমার যে পরিচয় তুমি পেছনে ফেলে গেছ, তাতে কারুকে মর্য্যাদা দেওয়া চলে না। তবু পুরন্দর, সত্য কথা শোন আজ। মুখোমুখি দাঁড়াও রঞ্জনরশ্মির। অবচেতনকে ভূতের মত ভয় করে দূরে সরিয়ে রেখো না। চেয়ে দেখ তার দিকে। কেন সহস্র রমণী তোমাকে তৃপ্তি দিতে পারতো না? হৃদয়হীন প্রতারকের মত খেলার পুতুল দু'দণ্ড পরে পথের ধারে ফেলে যেতে তুমি। চল্লিশ বছর বয়সেও কেন বিবাহ করতে পারোনি? কারণ, তোমার অবচেতন মন অজানিত একটি স্থানে নিবদ্ধ হয়ে থাকতো। কে সে? নাম করলে শিহরিত হবে। সে তোমার মা। ঈডিপাস্ কম্প্লেক্স বলি, ফিক্সেশন বলি, খুঁজে বেড়াতে তুমি জননীর প্রতিচ্ছায়া। জীবনে একটি মাত্র নারীকে ভালবেসেছ তুমি, আদর্শ সন্তান ছিলে তাঁর। যে নারী তোমার জননীর তিলমাত্র প্রতিচ্ছায়া ধারণ করতো, তারি কাছে ছুটে যেতে তুমি।' আমার কাছে এসেছিলে, কারণ, আমার গলার স্বর ছিল তোমার মায়ের স্বর।

নলিনী বিষদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে, সকলের দৃষ্টি আমার

দিকে। তারা ভাবতো তুমি আমাকেই বিয়ে করবে। কারণ, আমাকে একেবারে ফেলে দিতে পারতে না তুমি অন্যদের মত। বারে বারে ফিরে আসতে আমারি কাছে। আমার কণ্ঠ তোমাকে ডেকে আনতো। মজ্জমান নাবিক ছুটে আসতো সাইরেনের গানে। বাংলা দেশকে গানে গানে প্লাবিত করে দিয়েছি। বেতারে বেজে উঠতো আমারি গান। পথে গ্রামোফোনে আমার সুর। তোমায় মায়ের মুখে শোনা ঘুম-পাড়ানী ছড়ার সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে বিপ্লব আনতো। ডাকতো আমার কণ্ঠ জননীর কণ্ঠ হয়ে। ছুটে আসতে আমার কাছে। অন্য সাদৃশ্য না পেয়ে ফিরে যেতে। তবু আমি জানি, তোমার আমার সঙ্গে বিবাহ হোত না, এদের কারুর সঙ্গে হোত না। তোমার বিবাহ ঠিক হয়ে গিয়েছিল যার সঙ্গে, সে আজ এখানে উপস্থিত নেই। জীবনে অত্যন্ত ঠকেছ পুরন্দর, তারই কাছে। তুমি হৃদয়হীন নির্ম্মম, তাকে ভালবেসেছ। কিন্তু সে তো তোমাকে ভালবাসেনি। সে ভালবেসেছে বিরুদ্ধ সম্পর্কের আত্মীয়কে, যার সন্তান সে বহন করছে গোপনে। তাকেই নিজের সন্তান ভেবে আনন্দে বিহ্বল হয়ে বিবাহের দিন স্থির করে ফেলেছ। কেউ না জানলেও আমি জানি।

মাতৃভক্ত সন্তান তুমি। মাতা চোখের জল ফেলে মনোনীতা পাত্রী অনীতা মিত্রকে দেখতে বললেন। একুশ বয়স তার, সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা। অনীতার মা বাল্যসখী, মেয়ের বিবাহের জন্যে অতিশয় ব্যস্ত হয়েছেন। মাতাকে সন্তুষ্ট করতে অনীতার বাড়ী গেলে। ফিরে এলে অন্য মানুষ। না, পুরন্দর কাউকে ভালবাসেনি বলে মিথ্যা বলেছি। এক জনকে ভাল বেসেছে সে, তার মা—সেই মাকে অনীতার মধ্যে দেখে উন্মাদের মতো ভালবেসে ফেললো সে অনীতাকে। বিবাহের কথা দিয়ে যাতায়াত আরম্ভ করলো।

সন্ধ্যার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল অনীতা গাড়ী-বারান্দার আলিসায় হেলান দিয়ে। এক-পিঠ কালো চুল তার সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়ে পুরন্দরের। রাত্রির আকাশের মত কালো, সাগরের মত তরঙ্গায়িত, অমাবস্যার মত ভীষণ চুলের যবনিকা। সমস্ত মনে বাঁশী বেজে উঠলো পুরন্দরের; অবচেতন মন ইঙ্গিত পাঠালো: 'এ'কেই তো খুঁজছি।' এই চুল তার পরিচিত। জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব রূপসী মায়ের ঠিক এই রকম এক-পিঠ চুল নিয়ে খেলা করেছে সে। ফিরে দাঁড়ালো অনীতা মাতার আহ্বানে। আশ্চর্য্য! পুরন্দরের মাতার তরুণী রূপ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। মিল শুধু একটাতে নয়, সর্ব্বত্র। পুরন্দর তো এ'কেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। শাশুড়ী ও ভবিষ্যৎ বধূর সাদৃশ্য অন্তরঙ্গ-মহলে বিস্ময়ের উদ্রেক করলো। অনীতার মা গর্ব্বভরে জানালেন যে, তিনি গর্ভাবস্থায় পুরন্দরের মায়ের পাশের বাড়ীতে থেকে সর্ব্বদা মেলামেশা ও সখী-চিন্তা করেছিলেন। তাই এ সাদৃশ্য।

অনীতা পুরন্দরকে সম্পূর্ণ ধরা দিয়েছিল বিবাহের পূর্ব্বে। কেন? ভালবাসায় নয়। সে পুরন্দরকে কণামাত্রও ভালবাসেনি। সন্তানকে পিতৃনাম দিতে চেয়েছিল সে। যেদিন পুরন্দরকে এ খবর জানালো, সেদিন কৃতার্থ হয়ে উঠলো পুরন্দর। এই তো কামনা। অনীতার দেহ থেকে নূতন রূপে জন্ম লাভ করা। বিবাহের পূর্ব্বেই সেই অধিকার দিল পুরন্দরকে অনীতা। দেবী সে। বিবাহের দিন যত শীঘ্র সম্ভব গোপনে স্থির করলো। কিন্তু অসুখ হয়ে পড়লো।

জানি, অনীতার অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ। পুরন্দরের মা তাকে কুড়িয়ে পাওয়া পোষ্য বলে বুকে তুলে নেবেন। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে-ই হবে। অনীতা যথাকালে বিবাহ করবে বিরুদ্ধ সম্পর্কের আত্মীয়কে, বাড়ীর প্রতিবাদের বিরুদ্ধে। জোর পাবে তখন সে। প্রেমকে

স্বীকার করবে। অনীতা আত্মদান করেছিল বিবাহের পূর্ব্বে; তাতে পুরন্দরের চক্ষে তার মূল্য হ্রাস হয়নি। পুরন্দর তাকে এত ভালবাসতো যে, আগে-পরের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। আমার কাছেও পুরন্দরকে আত্মদান করা না করা অবান্তর।

সেই তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে আমার সমস্ত সুখ, সমস্ত ভবিষ্যৎ জ্বলে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। আমার চোখে জানার আলো জ্বলেছে, চেয়ে দেখেছিল পুরন্দর। অস্বস্তি বোধ করেছিল সে। আর কি প্রেম হয়? সতর্ক দৃষ্টি আমার দূরবীক্ষণের তীক্ষ্ণতায় তার আসল সত্তা আবিষ্কার করে ফেলেছে, এ কথা বুঝেছিল পুবন্দর। কিন্তু আমার মধ্যের সত্যকে সে আবিষ্কার করতে পারেনি। আমি তো স্বীকার করিনি।

পুরন্দর, তুমি ভাবতে তোমার ঐশ্বর্য্যে আমার লোভ? দশ জন মেয়ের মত তোমাকে বিবাহ করতে চাই সম্পদের আশায়? কিন্তু পুবন্দর, যে কথা আধুনিক সমাজে কেউ জানেনা, যে কথা তোমরা বীজমন্ত্রের মত গোপন রেখেছ, সে কথা যে আমি জানি। আজ যারা তোমার মৃত্যুতে সম্পত্তি-লাভের আশায় হৃষ্ট হচ্ছে, তারা তো জানে না কত অলীক সেই আশা। কেন তুমি হৈমবতীকে তোয়াজ করতে সম্পত্তির প্রত্যাশাতে—কেন অনীতা মিত্রকে বিস্তর মুদ্রার সঙ্গে তোমার মা মনোনীতা করেছিলেন? পুরন্দর, তুমি মরে ভালোই করেছ। চোরাবালি ছিল পায়ের নীচে, ক্রমেই ডুবে যাচ্ছিলে তুমি। শেষে হয়তো ভরাডুবি হোত! ওই সম্পত্তি—যার জন্যে তুমি আমাকেও লুব্ধ ভেবে আমার দিকে ফিরেও চাওনি, পুরন্দর, সে সম্পত্তি যে মরীচিকা মাত্র। দেনার দায়ে বহুবার বন্ধক দেওয়া বিষয়ে কে আশা রাখে? আমি কি করে জানলাম, কেউ যে কথা জানে না? আমাকে সে-ই

বলেছে যার হাতে ধরে তোমার বৃদ্ধ পিতা শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন গোপনতার। সে-ই আমাকে বলেছে, যার কাছে তোমাদের চুলের টিকিটি পর্য্যন্ত বিক্রীত। সে শপথ চাপল্যে ভাঙেনি, প্রাণের দায়ে ভেঙেছিল। সে-ও ভেবেছিল আমি তোমার টাকার অলীক মোহে ভুলেছি। তাই প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছিল সে দলিল-পত্র দেখিয়ে। কেন? সে আমার পাণিপ্রার্থী ছিল। আমি—আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি।

জীবনে একমাত্র নারী, যে পুরন্দরকে স্বার্থশূন্য প্রেমে ভালবেসেছিল, সে আমি। মিথ্যা বলে বাঁধতে পারতাম তাকে কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে। কিন্তু অনিচ্ছায় বন্ধন দিতে চাইনি আমি, যখন সে আমাকে ভালবাসেনি। কেন তাকে চিনেও ভালবাসলাম প্রতিদানের আশা না রেখে? কেউ কেউ আলোর চেয়ে অন্ধকার পছন্দ করে কেন? কেন বিষ তুলে নেয় অমৃতের পাত্র দূরে ঠেলে? এ ভালবাসা কারণহীন, অন্ধ। যুক্তি-তর্কের জালে ধরা পড়ে না। রঞ্জনরশ্মিও এ প্রেমের স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে পারে না। এখানে রঞ্জনরশ্মিও পরাজিত।'

সমাপ্ত